বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত
একটি সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

ষষ্ঠদশ বর্ষ □ চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর 1994 পাঁচ টাকা

এই সংখ্যায় থাকছে

নিম থেকে মুনাফা

গ্যাট নিয়ে দু-চার কথা

পরিবেশ দূষণের তাণ্ডব

জীন নিয়ে ডাকাতি

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের শিকার—
গরীব দেশের নারী ?

শুয়োর পালছেন নাট্যকর্মীরা

ফিলিপাইন্‌সের বিচিত্র আন্দোলন

নিপীড়িতা প্রতিবন্ধী নারী—
মহারাষ্ট্রে যা ঘটছে

সংবাদ পরিক্রমা

ভিডিও ফিল্ম—কিস্‌কি রক্ষা

আমাদের কথা

কলকাতায় ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্য প্রতিনিধিদের নিয়ে কনকর্ড বিমান এসে নেমেছে। অনেকেই ভাবছেন যে আমরা হয়ত এক উন্নত কনকর্ড-প্রযুক্তির যুগে ঢুকে পড়লাম। সত্যিই, চারিদিকে এখন এক আশার ছবি আঁকার চেষ্টা চলছে জোর কদমে। মন্ত্র একটাই—শিল্প বসাও, আরও শিল্প বসাও। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার এটাই একমাত্র রাস্তা, বিশেষত সমস্যাসংকুল পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে। আর এর পাশাপাশি চাই মেগাসিটি, প্রশস্ত রাস্তাঘাট, এন আর আই কমপ্লেক্স আরও অনেক কিছু।

এসব কাজে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসছেন বিশ্বব্যাঙ্কের মত সংস্থা থেকে দেশী-বিদেশী অনেক উদ্যোগপতিই, আসছেন আমেরিকা প্রবাসী 'কৃতী' বাঙালিরাও—খবরের কাগজের সপ্রশংস আলোচনা যাঁদের যথেষ্ট পরিচিত করে তুলেছে মধ্যবিত্ত মহলে।

এঁদেরই একজন প্রধান পুরুষ জানিয়েছেন যে পেট্রোকেমিক্যালসের পরে প্লাস্টিক শিল্প বসানোর প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা। আর এখান থেকেই শুরু হয় এ বিষয়ে আমাদের দু' চারটি কথা বলার ইচ্ছা।

যে অঞ্চলে আমরা বসবাস করি তার উন্নয়ন কোন পথে হবে তা ঠিক করতে গেলে এখানকার জল, মাটি, পরিবেশ, মানুষের দক্ষতার ধারা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

লেখা বা রিপোর্ট পাঠানো বা অন্যান্য যে কোন কারণে যোগাযোগ—

(1) অভিজিত লাহিড়ী
পি—252, লেক টাউন, ব্লক-এ,
কলিকাতা—700 089, ফোন—34-7982

(2) সুভাষ গাঙ্গুলী
বি—22/8, করুণাময়ী
হাউজিং এস্টেট, সল্ট লেক,
কলিকাতা—700 091, ফোন—359-0297

এরকম বহু কিছুর সুযত্ন চর্চা শুরুতেই করা উচিত বলে আমাদের মনে হয়। আমাদের এই অঞ্চল আফ্রিকার রুক্ষ 'সাহেল' নয়। বস্তুত জল সম্পদ আমাদের যথেষ্ট। অথচ এর সুনিপুণ ব্যবহার কি করে আমাদের সমস্যা মেটাতে পারে সে সম্পর্কে উদাসীনতা ব্যাপক। সফট্ওয়্যার টেকনোলজি নিয়ে মাতামাতি চলে। পাশাপাশি 'পুকুর উন্নয়নের টেকনোলজি' অবহেলিত। অথচ দক্ষিণবঙ্গে মাছ ও জলচর অন্যান্য প্রাণী, সবজি, পাট, সাইকেল, তাঁতের কাপড়, টালির বাড়ী ইত্যাদির উপর দাঁড়িয়ে এক ছড়ান-ছেটান উন্নয়নের কথা হয়ত ভাবা যেত। যদিও সে কথা জোরগলায় বলা তো দূরের কথা ভাবতেও আমাদের সাহস হয় না।

তবুও আমরা বলছি একটু চিন্তা করুন, স্বাস্থ্য জীবন সব দিকের সুদূরপ্রসারি লাভ-ক্ষতির কথা চিন্তা করে আমরা কি বলতে পারি 'আমাদের' উন্নয়ন, স্থায়ী উন্নয়ন আসার জন্য আরও বেশী যত্ন ও ধৈর্যশীল চর্চার দরকার?—এই উচ্ছ্বাস ও তাড়াহুড়ো আমাদের কোনো গাড্ডায় ফেলবে না তো?

সূচীপত্র

আমাদের কথা—1 ☐ পেটেন্ট আইন ও নিম : নয়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন / অভ্র চক্রবর্তী—3 ☐ আই এম এফ—ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নতুন সাঙাত গ্যাট / রবীন চক্রবর্তী—6 ☐ পরিবেশ দূষণের রকম সকম ও ক্ষয়ক্ষতি / রবীন মজুমদার—9 ☐ ফসলের জীনগত বৈচিত্রের বিলুপ্তি / কালমেঘ মন্ডল—14 ☐ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তৃতীয় বিশ্বই লক্ষ্য—কেন? / কাজল রায়—20 ☐ শুয়োরের খামার ও কয়েকজন নাট্যকর্মী / অপূর্ব, মানিক—24 ☐ 'ডিপো-প্রভেরা' নিয়ে বিক্ষোভ—একটি রিপোর্ট / পূরবী ঘোষ—27 ☐ ফিলিপাইন্সের পেপসি-বিরোধী আন্দোলন / সংকলক : সুরঞ্জন—29 ☐ মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলাদের জরায়ু ছেদন—নিষ্ঠুরতার এক উদাহরণ / সংকলক : অমিতা—32 ☐ জল কন্দুর গড়ায় / র. চ.—36 ☐ প্লুটোনিয়াম চোরাই / র. চ.—37 ☐ দেড় কোটি বনাম কুড়ি / র. চ—37 ☐ চিত্র সমালোচনা—39।

পেটেণ্ট আইন ও নিম ঃ নয়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন

তৃতীয় বিশ্বের কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবে, এই ছিল সবুজ বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি। কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে সন্দেহ নেই, তবে তা ভালোর দিকে না খারাপের দিকে তা নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অন্য সব কিছু বাদ দিলেও উচ্চফলনশীল শস্য চাষের ফলে পোকার উপদ্রব যে প্রচন্ড বেড়েছে, আর বর্তমানে সর্বাধুনিক কীটনাশক ব্যবহার করেও যে তাদের বাগে আনা যাচ্ছেনা একথা চাষের বিষয়ে ওয়াকিবহাল সব মানুষই জানেন। প্রথম দিকে উচ্চফলনশীল শস্য চাষে বহুজাতিক কীটনাশক উৎপাদক সংস্থাগুলির বিক্রি প্রচুর বেড়ে ছিল, বাজার এখনও তেজী আছে, তবে কীটনাশকের ক্রমহ্রাসমান কার্যকারীতা এবং চাষীদের এর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ওই কোম্পানিগুলির সেল্‌স ডিপার্টমেন্টকে বেশ আতঙ্কিত করে তুলেছে। রাসায়নিক কীটনাশকের এই দুর্দিনে কোম্পানীর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে প্রাকৃতিক কীটনাশকের উপর। দেখা যায় বিভিন্ন গাছগাছড়ার নির্যাস কীটনাশক হিসাবে খুব ভালো কাজ দেয় এবং নিমগাছ এ ব্যাপারে এককথায় অসাধারণ। কীটনাশক হিসাবে নিমের ব্যবহার ভারতের চাষিরা বহু শতাব্দী ধরে করে এলেও বৈজ্ঞানিক ভাবে এর কার্যকারিতা সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন ভারতের কৃষ গবেষণা সংস্থার (ইন্ডিয়ান এগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) বিজ্ঞানী ডঃ প্রধান 1962 সালে।(1) এরপর বহু গবেষণায় কীটনাশক হিসাবে নিমের কার্যকারিতা সন্দেহাতিত ভাবে প্রমানিত হয়। দেখা যায় যে নিম 198 রকম ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও প্রাণীর বিরুদ্ধে সক্রিয়,(2) কিন্তু এর থেকে দূষণের কোনোও সম্ভাবনা নেই। মানুষের উপকারি কোনো প্রাণী এর দ্বারা আক্রান্ত হয়না। মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও এটা নিরাপদ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লু. এইচ. ও) মতে 1972 সালে যেখানে সারা বিশ্বে 200000 মানুষ কীটনাশকের বিষ-ক্রিয়ায় আক্রান্ত হন এবং 2000 মানুষ মারা যান,(3) সেখানে কীটনাশক হিসাবে নিম প্রকৃতির আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যেখানে প্রযুক্তির শেষ কথা মুনাফা এবং ধনী দেশের সরকার ও ব্যবসার মূল বৈদেশিক নীতি তৃতীয় বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুন্ঠন, সেখানে এই মূল্যবান গবেষণা সাধারণ মানুষের নাগালের বহুদূরে চলে যেতে বেশী সময় লাগেনা। পশ্চিমের বাণিজ্য চক্রের চাঁই রবার্ট লার্সন ভারতে তার বেশ কয়েকটি বাণিজ্য সফরে এসে নিমের গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হন এবং ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকাল-চার-এর সহায়তায় নিমবীজের শাঁসের উপর পেটেন্ট নেন। (ইউ এস পেটেন্ট নং, 4556562 ডেটেড-ডিসেম্বর 3, 1980।(4) ভারতে 1995 সালের 1লা জানুয়ারী থেকে ডাঙ্কেল প্রস্তাব কার্যকরি হবে এবং লার্সণ সাহেব তার পেটেন্ট আইনের জোরে চাষীদের কাছ থেকে হয়তো কেড়ে নেবেন নিমকে কীটনাশক হিসাবে ব্যবহারের অধিকার।

তারপর নিম থেকে পাওয়া বহু জৈব রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরী হবে নতুন নতুন কীটনাশক, কীটনাশকের বাজার আবার তেজী হবে।

ডব্লিউ আর গ্রেস, লার্সন সাহেবের কাছ থেকে নিম থেকে তৈরী কীটনাশক বাজারে বিক্রির সত্ব কিনে নেয়। এরা এবং পি. জে. মার্গো প্রাইভেট লিমিটেড বর্তমানে নিম থেকে কীটনাশক তৈরীর কারখানা বসাবার পরিকল্পনা নিয়েছে। এদের চাহিদা মেটাতে এখন থেকেই লক্ষ লক্ষ টন নিম বীজ ও পাতা সরবরাহ করা হচ্ছে, ফলে অচিরেই নিম বীজ ও পাতা দুর্লভ হয়ে উঠবে। নিম থেকে এভাবে কৃত্রিম উপায়ে কীটনাশক তৈরী করার অন্য একটা মারাত্মক দিক আছে। সাধারণ রাসায়নিক কীটনাশকের বিরুদ্ধে পোকারা 5-10 প্রজন্মের মধ্যেই প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। কারণ কীটনাশক পোকার কোনো নির্দিষ্ট জৈবরাসায়নিক কার্যাবলীকে বন্ধ করে দেয়। সেই নির্দিষ্ট জৈবরাসায়নিক ক্রিয়াপথকে সামান্য পরিবর্তন করে নিতে বা কীটনাশকটিকে নষ্ট করে ফেলার বা নিষ্ক্রিয় করে দেহ থেকে বার করে দেবার মত জেনেটিক পরিবর্তন বিপুল সংখ্যক পতঙ্গের মধ্যে দু একটির দেহে ঘটে যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। ফলে কীটনাশকের ব্যবহার উপেক্ষা করে তারা বেঁচে থাকে ও বিপুল পরিমানে বংশ বৃদ্ধি করে। এইভাবে আস্তে আস্তে কয়েক প্রজন্মের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি পোকাই কীট নাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হয়ে পড়ে। এছাড়াও কীটনাশক পোকা মারার সাথে সাথে তাদের প্রাকৃতিক শত্রু যেমন ব্যাঙ, গিরগিটি বা অন্যান্য মাংসাশী বা পরজীবী পোকাকে শেষ করে ফেলে। তাই একদিকে প্রাকৃতিক শত্রুর পরিমান কমে যায় অন্যদিকে পোকাদের দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, ফলে পোকার আক্রমন ব্যাপক বাড়ে। যেমন বিজ্ঞানীদের মতে ধানক্ষেতে ব্রাউন রাইস প্ল্যান্ট হপার পোকাটির উপদ্রব মারাত্মকভাবে বাড়ার একমাত্র কারণ রাসায়নিক কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার।(5) নিম কিন্তু সেদিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর পাতা ও বীজের মূল অরিষ্টের (ক্রুড এক্সট্রাক্ট) মধ্যে বহু জৈব রাসায়নিক পদার্থ আছে যা পতঙ্গের একাধিক তন্ত্রকে (যেমন স্নায়ুতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র ইত্যাদি) একসাথে আক্রমন করে, তাই এর সবকটি জৈবরাসায়নিক পদার্থের বিরুদ্ধে একসাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলা কোনো পতঙ্গ-গোষ্ঠির পক্ষে প্রায় অসম্ভব। প্লুটেল্লা জাইলোস্টেল্লা নামক একটি পতঙ্গের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে 35 প্রজন্ম পরেও নিমের বিরুদ্ধে এদের মধ্যে কোনো প্রতিরোধ গড়ে ওঠে নি। (6) বহু-জাতিক কোম্পানীগুলি কিন্তু তাদের ব্যবসার কথা মাথায় রেখেই নিম থেকে পৃথক করা এক একটি কীটনাশকের জৈবরাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কীটনাশক বানাবে ও বাজারে ছাড়বে। ফলে একই কায়দায় পোকাদের মধ্যে গড়ে উঠবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা। যেমন নিম থেকে পৃথিকৃত কীটনাশক জৈব-রাসায়নিক পদার্থগুলি হল I. অ্যাজা-ডিরাকটিন II. স্যালানিন III. নিমবিন IV. ডি-অ্যাসিটাইল নিমবিন V. থিওনিমন ইত্যাদি। ধরুণ প্রথমে কোনো কোম্পানি অ্যাজাডিরাকটিন থেকে তৈরী কীটনাশক বাজারে ছাড়লো। তাতে বেশ কিছুদিন কাজ হল, কিন্তু অচিরেই তার বিরুদ্ধে পোকাদের দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তখন তারা স্যালানিন বাজারে ছাড়বে। এইভাবে নিমজাত প্রত্যেকটা কীটনাশকের বিরুদ্ধে পোকারা প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলবে এবং শেষ পর্যন্ত কীটনাশক হিসাবে নিমের কোনো গুরুত্বই থাকবেনা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি এটা করবে কেন? তার কারণ নিমের মূল অরিষ্টের (ক্রুড এক্সট্রাক্ট) ব্যবহার করলে পোকার সংখ্যা কমবে, তাদের দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠবেনা, কিন্তু পোকার প্রাকৃতিক শত্রুর সংখ্যা কমবেনা, তাই হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই শস্যক্ষেত্রের বাস্তুতন্ত্র এমন অবস্থায় আসবে যখন পোকা দমন করতে খুব সামান্য কীটনাশক লাগবে, কিন্তু অত কম কীটনাশক বিক্রি হলে

তো কোম্পানি চলবে না, মুনাফার পাহাড়ও হবে না—অতএব……।

নিমকে কিন্তু খুব সহজেই কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ধানজমি তৈরীর ক্ষেত্রে নিমের পাতা ও নিমের খোল জমি তৈরী করার সময় লাঙল দিয়ে মাটিতে সবুজ সার দেবার মত করে মিশিয়ে দিলে তা স্থায়ী ভাবে কীটনাশক হিসাবে কাজ করবে। চ্যারা রোপন করা হয়ে গেলে 125 মিলি নিমতেল 375 মিলি জলের সাথে মিশিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিয়ে একবিঘা জমিতে স্প্রে করলে তা বিভিন্ন পোকার বিরুদ্ধে যথেষ্ট ভালো কাজ দেবে। স্প্রে করতে হবে সন্ধ্যার দিকে কারণ সূর্যালোকে নিমজাত অনেক কীটনাশকই নষ্ট হয়ে যায়। পোকার উপদ্রব অনুসারে সপ্তাহে একদিন কি দুদিন স্প্রে করলেই যথেষ্ট। নিম-তেলের সাথে সামান্য রেড়ি ও তিলের তেল মিশিয়ে নিলে ভালো কাজ হবে। কিছু মুনাফা শিকারী বিদেশী কোম্পানির কথায় আমরা কেন উঠবো বসবো? আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের মত করেই আমরা ব্যবহার করবো। উপরি উক্ত পদ্ধতিতে নিমকে কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করলে নিঃসন্দেহে ক্ষেতে পোকার উপদ্রব যথেষ্ট কমবে, বেঁচে থাকবে আমাদের পূর্বপুরুষের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। □

অভ্র চক্রবর্তী

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

1. টেন্ডিং দি আর্থ, ট্র্যাডিশনাল সাস্টেনেবেল এগ্রিকালচার ইন ইন্ডিয়া—উইনিন পেরেরা, 1993, পৃষ্ঠা—221
2. পেস্ট ম্যানাজমেন্ট অ্যান্ড দি এনভায়রনমেন্ট ইন 2000—সম্পাদনা ঃ আব্দুল আজিজ, এস এ কবীর এবং হেনরী এস বার্লো। সি এ বি ইন্টারন্যাশনাল, 1992, পৃষ্ঠা—150
3. 'পেস্ট কন্ট্রোল'—এইচ এফ ভ্যান এমডেন, দ্বিতীয় সংস্করণ, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা—14
4. গ্রন্থপঞ্জি (1), পৃষ্ঠা—223
5. এগ্রিকালচারাল ইনসেক্ট পেস্ট অফ দ্যা ট্রপিক অ্যান্ড দেয়ার কন্ট্রোল—ডেনিস এস হিল, দ্বিতীয় সংস্করণ 1983, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা 187
6. গ্রন্থপঞ্জি (2), পৃষ্ঠা—151

বন্ধ ও রুগ্ন কল-কারখানার প্রকৃত অবস্থা জানতে নাগরিক মঞ্চর শ্রমিক-সহায়ক পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন—

নাগরিক মঞ্চ, 134, রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড।
রুম নং—7, ব্লক—বি, কলিকাতা—700085

পুরোন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার একটি বাঁধান ভল্যুম পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কেউ নিয়ে গিয়ে থাকেন তো সত্বর ফেরত দিন।

যোগাযোগ—
রবীন চক্রবর্তী

আই এম এফ—ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নতুন সাঙাত গ্যাট

নয়া গ্যাট চুক্তি সই হয়ে গেছে। 117টি দেশের সম্মতি মিলেছে। খুশি মনে সই দিয়েছে সবাই এমন নয়। এ নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন কম হয়নি, —এদেশে এবং অন্য দেশেও। চুক্তি -সই ঠেকানো যায়নি। কথায় বলে—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আর কর্তাটি যদি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা'লে তো কথাই নেই।

প্রশ্ন হল হঠাৎ ওরা গ্যাট নিয়ে পড়ল কেন? তবে কি বাণিজ্য-লক্ষ্মী ডালা উপুড় করে সব দেশের ঘর ভরে দিক এটাই ওরা চাইছে? —মনে হয় না। অন্তত এমন কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। —তাহলে? প্রশ্নটা তোলা থাক। পরে বিবেচনা করা যাবে।

আই এম এফ বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার এবং ডব্লিউ বি বা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নাম সবাই জানেন। —কাজ কর্ম? তাও না জানেন এমন নয়। তাদের অনেক কাজ। তার মধ্যে একটি —বিপদে টাকা ধার দেওয়া। কোন দেশের টাকার দরকার পড়লে ঋণ দেয় এরা। সুদ যে খুব বেশী তা নয়। এই হিসেবে দেখলে বেশ উপকারী সংস্থা বলেই মনে হবে। আসলে তা নয়। টাকা ধার নিতে গেলে টিকি বাঁধা রাখতে হয়। মুচলেখা দিতে হয়. 'কিছু শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে বাধ্য থাকিব' এই মর্মে। আসল প্যাঁচ সেখানেই।

গ্যাট নিয়ে আলোচনায় আই এম এফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আসছে কেন প্রশ্ন উঠতে পারে। কেন, সেটা বলতেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। আসলে আই এম এফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের তাবৎ দেশকে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বেঁধে অসম ব্যবসায়িক লেন দেনের যে প্রক্রিয়া এতদিন চলত সেটাকেই পাকাপোক্ত করতে নয়া গ্যাট-ফর্মুলা।

আই এম এফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের শর্তগুলি কেমন? অনেকটা এই রকম। যেমন ঋণ নিতে হলে সব রকম ভরতুকির ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে বা সংকুচিত করতে হবে। কৃষি উৎপাদনে ভরতুকি তুলে দিতে হবে। খাদ্য-ভরতুকি কমাতে হবে। উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের বাধা তুলে দিতে হবে। আমদানী-র ব্যাপারে সমস্ত কড়াকড়ি শিথিল করতে হবে। পরিষেবা ক্ষেত্রকে ব্যক্তি-মালিকানায় আনতে হবে। ব্যাঙ্কিং-ইন্সিওরেন্স ইত্যাদি বেসরকারীকরণ করতে হবে। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ উন্নয়ন ক্ষেত্রে ঋণের জন্য বিশেষ শর্ত দেওয়া হয়। যেমন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে কিনতে হবে ইত্যাদি।

শর্তগুলো দেখে কি মনে হয়? দেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারে হাত-পা বাঁধা হয়ে গেল নাকি? অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার সুযোগ তো চুলোয় গেল। তাছাড়া দেশের মানুষের প্রয়োজনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষমতাও দেশ পরিচালকদের হাতছাড়া হল। মোট কথা আই এম এফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কাছ থেকে হাঁটু গেড়ে ধার চাইতে যাওয়া মানে হাঁটু ভেঙ্গে আসা। তারপর আজন্ম ভাঙ্গা হাঁটু নিয়ে চলা। মর্মকথা একটাই। ঋণ পেতে হলে বহুজাতিক কোম্পানী-

গুলিকে দেশের বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার দিতে হবে।

অন্যদিকে গ্যাট হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক-নীতি সংক্রান্ত একটি চুক্তি মাত্র। এই চুক্তির ভিত্তিতে এক দেশ অন্য দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়। —অন্তত এতদিন চালাত (সব ক্ষেত্রে নয়)। দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি বা তার নিয়মনীতির ওপর আবশ্যিকভাবে এর কোন এক্তিয়ার বা প্রভাব এতদিন ছিল না। মাঝে মধ্যে আন্তর্জাতিক বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে এর নিয়মকানুন প্রয়োজনে রদ-বদল হত। সেই রকম একটি বৈঠক বসেছিল উরুগুয়েতে গত 1986 সালে। সেই বৈঠকেই গ্যাট-এর প্রধান মিঃ আর্থার ডাঙ্কেল গ্যাট-এর খোল-নোলচে বদলানোর প্রস্তাব দেন। বহু তর্ক বিতর্কের শেষে এই বছর এপ্রিল মাসে তা গৃহীত হয়। কার্যকর হবে আগামী বছরের গোড়া থেকে।

নয়া চুক্তিতে এর এক্তিয়ার বহুদূর বিস্তৃত করা হয়েছে। এতদূর যে অনেক ক্ষেত্রে তা দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও নাক গলানোর সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর খবরদারী করার সুযোগ এনে দিয়েছে এই সংস্থার হাতে। সমস্ত সদস্য দেশের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে। অন্তত কাগজে-কলমে তাই স্বীকৃত। কিন্তু তাও কি হয়? সবল রাষ্ট্রের ওপর জারিজুরি খাটবে?—কদাপি নয়। হম্বিতম্বি হবে দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর। নতুন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরী হচ্ছে এজন্য। নাম—ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। —সংক্ষেপে ডব্লু টি ও। পুরণো গ্যাট-এর স্থলাভিষিক্ত হবে ডব্লু টি ও। চুক্তিমত শর্ত পালিত হচ্ছে কিনা নজরদারি করবে এরা। বেয়াদপি করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। তেমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে একে।

কেন আই এম এফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের প্রসঙ্গ টানা হয়েছে সে আলোচনায় আসা যাক। আসলে নয়া গ্যাট-চুক্তির অন্তর্গত শর্তগুলোর সাথে আই এম এফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের শর্ত গুলোর এমন আশ্চর্যজনক মিল যে দেখে চমৎকৃত না হয়ে পারা যায় না। মনে হয় ওটা থেকে হুবহু টুকে দেওয়া হয়েছে। তবে এর প্রভাব কোন ছোট পরিসরে আবদ্ধ থাকবে না। সুদূরপ্রসারী হবে। এমন সব নতুন নতুন ক্ষেত্রে এর এক্তিয়ার বিস্তৃত যা এতদিন একশত ভাগ দেশের আভ্যন্তরীণ নিয়ম-নীতি-আদর্শ অনুযায়ী বিবেচনার বিষয় ছিল।

নয়া গ্যাট-চুক্তির শর্তের মধ্যে আছে—সদস্য দেশগুলিকে আমদানীর শুল্ক হ্রাস করতে হবে এবং আমদানীর ওপর থেকে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে হবে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভরতুকি দেওয়া চলবে না। সীমিত ক্ষেত্রেই রেশনিং ব্যবস্থা চালু রাখা যাবে। ন্যূনতম একটি পরিমাণ কৃষিপণ্য বাধ্যতামূলকভাবে আমদানী করতে হবে—প্রয়োজন না থাকলেও। উদ্ভিদ ও কৃষি বীজের ক্ষেত্রে পেটেন্ট ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তা তুলে নিতে হবে। দেশী ও বিদেশী পুঁজির মধ্যে কোনরকম পার্থক্য করা চলবে না। অর্থাৎ বিদেশী কোম্পানী গুলোকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালাতে দিতে হবে। কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তিবিদ্যা কোথা থেকে আসবে সে ব্যাপারে কোম্পানীগুলির ওপর খবরদারি চলবে না। ব্যাঙ্ক, বীমা, টেলি-যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ রাখতে হবে। ফিরিস্তি লম্বা করে লাভ নেই। এক কথায় গোটা বিশ্ব জুড়ে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলিকে যা-ইচ্ছে-তাই করতে দিতে হবে। —এই মর্মে ছাড়পত্রের অপর নাম নয়া গ্যাট চুক্তি।

আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়—আই এম এফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক একদিন ঋণ দেওয়ার বিনিময়ে যা করে এসেছে নবরূপে গ্যাট সেটাকেই আরো পাকাপোক্ত করতে চলেছে।

যে প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছিল যে, গ্যাট চুক্তি নিয়ে

মার্কিনীদের কেন এত মাথা ব্যথা, তার উত্তর নিশ্চয়ই মিলেছে। আই এম এফ-ওয়ার্ল্ড' ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভালই চলছিল কারবার। তবে ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র ছিল না। কারণ ঋণ নিতে এলে তবেই কাউকে কব্জায় মিলত এতদিন। যদি কেউ সেই রাস্তা না মাড়ায় তো সে ফস্‌কে গেল। তাই ফস্‌কে যাতে কেউ না যেতে পারে সেজন্যই এত কায়দা কানুন। বিশ্ব বাণিজ্যের নাগাল এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই কোন দেশের। বিশেষ করে আজকের দুনিয়ায়। ফাঁদটা তাই সেখানেই পাতা। নয়া-গ্যাটের গাঁট এড়িয়ে যাওয়ার উপায় রইল না কারুরই। —চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাকে বলে। □

রবীন চক্রবর্তী

শ্রমিকদের প্রাপ্য কয়েক কোটি টাকা মেরে, বেআইনীভাবে বরানগর জুট মিল বন্ধ করে দিয়ে পালিয়ে গেছে মালিক। শ্রমিকরা কিন্তু পালিয়ে যাননি, 'মজদুর কমিটি'র পতাকা হাতে নিয়ে লড়াই করছেন শত অসুবিধার মধ্যেও। এই অবস্থায় তাঁদের দরকার একটু সহযোগিতা ও সাহায্য। যে কোন দিন (মঙ্গলবার হলে ভাল হয়) সন্ধেবেলায় চলে আসুন মিলের পাওয়ার হাউস্‌ গেটের কাছে মজদুর কমিটির ইউনিয়ন অফিসে। লড়াইরত শ্রমিকদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করুন।

অর্থ সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা ঃ
শ্যাম দাস, সাধারণ সম্পাদক
বরানগর জুট ফ্যাক্টরী
শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
54, রামচন্দ্র বাগচী লেন
আলমবাজার, কলিকাতা—700035

বিষয় ঃ পরিবেশ

তিন

[পরিবেশ নিয়ে যত লেখালেখি হচ্ছে, প্রশ্ন উঠছে তার চেয়েও বেশী। আর সেটাই স্বাভাবিক। প্রশ্নগুলোকে পাশ কাটানোর চেষ্টাই অস্বাভাবিক। অথচ তাই-ই ঘটছে। সেটা চাই না বলেই এই দপ্তর—বিষয় ঃ পরিবেশ।

দূষণের সমস্যার সমাধানের সূত্র বিজ্ঞান কারিগরিতে যতটা, ততটাই, সমাজে সংস্কৃতিতে ও পরিবেশে। মানুষই কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর শেকড়টা এখানে, তারপর ছড়াক সে ডালপালা।

দপ্তর পরিচালনা সম্পাদনা করছেন ছোট্ট একটি দল। কিন্তু লিখতে পারেন সকলেই।

পরবর্তী সংখ্যাতেও আলোচ্য ঃ দূষণের রকম-সকম ও ক্ষয়ক্ষতি। তারপর বায়ু জল মাটি ইত্যাদি দূষণের বিষয়ে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে। কমবেশী এক হাজার শব্দের মধ্যে লেখা পাঠান। অথবা চিঠিপত্রে মতামত জানান—সঃ মঃ]

পরিবেশ দূষণের রকম সকম ও ক্ষয়ক্ষতি

তা বাবু, দু'সন হ'য়েলো এয়েচি শওরে।
কি করবো ? জোয়ান ছেলেডারে আমার
কেড়ে নিলে ভগমান !
বাপেরে তার বাগে খেইচিলো
সে পিরায় দশ সন হ'লো।
তাও ছেনু ভিটেতে, আশায় বুক বেঁদে।

সেই যিবার কল বসল ভিটের কাচে
বাবুরা কইলে, তোমার কপাল ফেরলো, গেনুর মা
হাতে টাকা হবে, ছেলের চাগরী, ভিটে বেচি দ্যাও।
তা হয়েলো বাবুরা, ছেলে আমার রোজগেরে হোয়েলো,
কি সোন্দর হোয়েলো চ্যায়রা !

কিন্তুক তিন সন যেতি না যেতি
কালি বন্নো হয়ে পুড়ে গেয়েলো শরীল

ডাকতর কইলে—বুক ঝ্যাঁজরা
কলের গ্যাসে। কেউ মানলো নি। আমার প্যাঁজড়া
ভেঙে থুয়ি চইল্যে গ্যালো, ছ্যাঁচড়া—
প্যাটের শত্তুর!
দূর দূর
ভগমান না ছাই!
কলের গ্যাসে সে ব্যাটাও নিকেশ হইয়েচে, হ্যাঁ।

শিল্পায়নের হাত ধরে এসেছে নতুন এক ধরণের দুর্ঘটনা—বিস্ফোরণ-আগুন-বিষ-জখম-মৃত্যু-ধ্বংস। 'সভ্যতার অগ্রগতির' সঙ্গে তাল রেখে শিল্পপণ্য যত বৈচিত্র্যে ও পরিমাণে বেড়েছে, ততই বেড়েছে তথাকথিত এইসব দুর্ঘটনা। তাদের প্রভাব সীমিত থাকেনি কারখানার বা কর্মস্থলের চার দেওয়ালের মধ্যে। সীমিত থাকেনি সময়ের গন্ডীতে। শ্রমিক কর্মীর নিরাপত্তা বা নিরাপদ উৎপাদন ব্যবস্থার ফাটল দিয়ে সেগুলি ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে, পরিবেশে; ব্যাপ্ত হয়েছে ভাবীকালে। ছোট-মাঝারি-বড় নানা মাপের রকমারি শিল্প দুর্ঘটনা আজ আমাদের নিত্য-সঙ্গী। পৃথিবী জুড়ে বছরে হাজারেরও বেশী তাদের সংখ্যা। জীবন ও সম্পদহানি, ধ্বংস আর নির্মমতার তাৎক্ষণিক একটা সাড়া জাগিয়ে তলিয়ে যায় কালের গর্ভে; কিন্তু থামে না তাদের ক্রিয়া। বর্তমান শতাব্দীর গুটিকয়েক দুর্ঘটনা স্মরণকে, আসুন আমরা একটু স্মরণ করি।

1916'র ডিসেম্বর। প্রথম মহা-যুদ্ধের আগুন জ্বলছে। কানাডার হ্যালিফ্যাক্স বন্দরে দাঁড়িয়ে ছিল একটি ফরাসী অস্ত্রবাহী জাহাজ—ম'ব্লাঁ। অকস্মাৎ ম'ব্লাঁ'র গায়ে ধাক্কা খেল ইমো—বেলজিয়ামের একটি জাহাজ। ইমো ছিল সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়া বিস্ফোরকে বোঝাই। প্রচন্ড বিস্ফোরণে বন্দর শহরের অর্ধেক গেল গুঁড়িয়ে। দু হাজারেরও বেশী মানুষ মারা পড়ল। আহত অন্তত আট হাজার। জনৈক 'ভাগ্যবান' এক মাইল উড়ে গিয়ে গাছের উপর আটকে পড়ে বেঁচে যান!

জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছে ওপ্পান শহরের একটি গুদামে মজুত ছিল প্রায় চার হাজার টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সার। শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে গেছিল। কোদাল গাঁইতি দিয়ে এই বিপুল চাঁইকে ভাঙা কি চাট্টিখানি কথা? আদেশ হলো ডিনামাইট চার্জ করে সারের পাহাড় ভেঙে ফেলার। আর তা করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এক ভয়ংকর বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিল গোটা গুদামটি, ধ্বংস করল ওপ্পান শহরের এক বিরাট অংশ। মেরে ফেলল 560 জনকে। আহত করল তিন হাজারেরও বেশী। 21 সেপ্টেম্বর, 1921 এর ঘটনা এটি।

জার্মানীরই লুডভিগ্‌স্‌হাফেন-এ আই. জি. ফারবেন কোম্পানীর ফ্যাক্টরী এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিল একটি রেল ওয়াগণ, 1948 এর 28 জুলাই। ওয়াগন-ভর্তি ছিল ডাইমিথাইলইথেন নামক উদ্বায়ী সহজদাহ্য তরল। শ্রমিকদের তা জানা ছিল না। তাদের অসতর্কতায় তরলে অগ্নিসংযোগ ঘটে যায়। গোটা কারখানাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মারা পড়েন সমস্ত কর্মরত লোকজন। এমনকি শহরেও শুরু হয় অগ্নিঝঞ্ঝা। মৃত ও আহত অন্তত পক্ষে দুশো ও চার হাজার।

প্রায় একই ধরণের আগুনে-ঝড় কার্যত ধ্বংস করেছিল ব্রাজিলের কুবাতাও শহরকে (25 ফেব্রুয়ারী, 1984)। পেট্রোল পাইপের ছিদ্র দিয়ে

চুঁইয়ে পড়ছিল পেট্রোল। 'ইন্ধন থাকলে স্ফুলিঙ্গের অভাব হয় না' আপ্তবাক্যের অভ্রান্ততা প্রমাণ হতে দেরী হয়নি। চোঁয়ানো তেল থেকে পাইপেও আগুন ধরে যায়। বিশাল অগ্নিগোলক ধেয়ে যায় শহরের উপর দিয়ে। জ্যান্ত পুড়ে মরে ছ'শো মানুষ, আহত হয় তিন হাজার। একই বছরে ভূপালের ঘটনার মাত্র দিন বারো আগে (19 নভেম্বর, 1984) মেক্সিকো নগরীর শহরতলী ইক্সোটেপেকও প্রত্যক্ষ করেছিল এক মারণযজ্ঞ! প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দে কাকভোরে ঘুম ভাঙে মানুষের। মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ ঘটে, চলে প্রায় একঘন্টা ধরে। অগ্নিগোলক ঘিঞ্জি বস্তির রাস্তায় নেচে বেড়ায়; দিনশুরুর চিতায় পুড়ে মরে পনেরো হাজার, আহত হয় সাত হাজার। আর এসবের মূলে ছিল রান্নার গ্যাস L P G'র গুদামে আগুন ধরে যাওয়া!

1987তে ফ্রান্সের নান্টেসে একটি মিশ্র সারের আধারে আগুন লেগে গেলে নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাশ সারের উপাদান ভেঙে গিয়ে আগুনের সঙ্গে বেরোতে থাকে নাইট্রিক অ্যাসিড, ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি। সেই বিষাক্ত আগুনের নিঃশ্বাসে আক্রান্ত হয় 43000 মানুষ, কুড়ি হাজার মানুষকে স্থানান্তরিত করতে হয়।

* * *

সব সময় অবশ্য বিস্ফোরণের শব্দে সচকিত করে বিপদ আসেনি। 1950-এ মেক্সিকোর পোজারিকায় একটি কারখানা থেকে একটানা 25 মিনিট ধরে বেরোতে থাকে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস। সরাসরি কোন মানুষের মৃত্যুর খবর জানা না থাকলেও গবাদি পশু মারা পড়েছিল অনেক এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত গাইয়ে পাখী—ক্যানারি-এলাকা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

1976-এর জুলাইতে ইতালির সেভেসোতেও বিপর্যয় নেমে এসেছিল প্রায় নিঃশব্দে। সুইস ওষুধ কোম্পানী হফম্যান লা রোশের ইতালীয় সহযোগী ইকমেসা কেমিক্যাল ডাই-অক্সিন তৈরীর নতুন এক পদ্ধতির পরীক্ষা চালাচ্ছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যরা জঙ্গলের পাতা-ঝরানোর 'ওষুধ' হিসেবে ব্যবহার করতো এই ডাই-অক্সিন। রাসায়নিক বিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আধার ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে ডাই-অক্সিন ও কস্টিক সোডা। কোম্পানি খবরটি চেপে যায়। কিন্তু ছোট ছোট উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র প্রাণী যেমন পাখী খরগোস, মুরগী মারা পড়তে থাকে। দিন দশেকের মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার গৃহপালিত পশুর মৃত্যুর পর স্থানীয় সরকার এলাকাটিকে চিহ্নিত করে বিষাক্ত বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হন। জনসাধারণ ইকমেসা কেমিক্যালের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কোম্পানির একজন নেতৃস্থানীয় এক্সিকিউটিভ বলে বসেন—'ইতালিয়ানরা বড্ড ছিঁচকাঁদুনে।...ক্যাপিট্যালিজম ও প্রগতি সমার্থক; প্রগতির পথে মাঝে মধ্যে একটু আধটু অসুবিধে হতেই পারে...।' অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠলে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হ'লো। এলাকাটিকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে একেবারে কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে এগারো হাজার অধিবাসীকে স্থানান্তরিত করতে হ'লো। তিনশোর মতো ঘরবাড়ী ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে অন্য জায়গা থেকে ভালো মাটি এনে চাপা দিয়ে দেওয়া হ'লো। পরবর্তী দুটি বলয়ের মানুষদের উপর চলল সমীক্ষা ও নজরদারি। অন্তত শ'চারেক শিশু এবং বেশ কিছু সংখ্যক বয়স্ক মানুষের মুখে ও শরীরে দেখা দিল ফোঁড়ার মত ফোস্কা ও যন্ত্রনাদায়ক চর্মক্ষত (Chloracne)। সন্তানসম্ভবা মায়েরা দলে দলে গর্ভপাত ঘটিয়ে ফেললেন।

কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা হ'লো। কয়েকজন এক্সিকিউটিভ গ্রেপ্তারও হলেন। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যেই তাঁরা জামিন পেয়ে যান। এদের মধ্যে ছিলেন কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর এনারিকো পাওলেত্তি। মামলার উপর ভরসা রাখতে না পেরে, সেভেসোর জনগণের প্রতি কৃত অপরাধের 'যথাযথ শাস্তি' দিতে এগিয়ে এলো 'প্রাইমা লিনিয়া'

গোষ্ঠীর এক মহিলা সহ চারজনের একটি দল। 1980'র ফেব্রুয়ারীর এক সকালে পাওলেত্তি প্রাণ হারালেন এদের গুলিতে।...মামলাটির নিষ্পত্তি হতে সময় লেগেছিল দশ বছর। দুজন পদাধিকারীর জেল হয়েছিল বছর খানেকের।

সেভেসোর চেয়েও নিঃশব্দে চুপিসারে 1984-র 2-3 ডিসেম্বর গভীর রাতে ইউনিয়ন কার্বাইড ইণ্ডিয়ার 30 টন মিথাইল আইসোসায়ানেট তথা মিক (MIC) গ্যাস ঘুমন্ত ভোপাল শহরে নেমে এসেছিল হামাগুড়ি দিয়ে। অন্ততপক্ষে তিন-হাজার মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণার আর্তনাদেও কোন বিস্ফোরণ ঘটেনি। দু'লক্ষাধিক মানুষের তিল তিল দুর্ভোগও ইউনিয়ন কার্বাইডের সাম্রাজ্যে ফেলতে পারেনি কোন আঁচড়। আমেরিকা ও ভারতে মামলার মহড়া শেষে 'গ্যাস-পীড়িতরা' পেয়েছেন যৎসামান্য অনুদান এবং 'ক্ষতিপূরণের' লম্বা-চওড়া প্রতিশ্রুতি!

সশব্দ কোন বিস্ফোরণ নয়, ভোপালের মত কোন 'নিঃশব্দ দুর্ঘটনাও' নেই, কোন নির্দিষ্ট কারখানা বা উৎসও অচিহ্নিত অথচ দলে দলে মানুষ মারা পড়ছে, পশুপাখী গাছপালা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে—এমন ঘটনাও নিতান্ত কম নয়।

1930-এর ডিসেম্বর। শীতের সময়। বেলজিয়ামের অন্যতম সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল মিউজ ভ্যালিতে নেমে এসেছিল এক ভয়ংকর ধোঁয়াশা (Smog)। অন্তত 60জন মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। হাজার হাজার পশুপাখি কবলিত হয়েছিল সেই বিষাক্ত ধোঁয়াশার। নানাধরণের স্থানীয় কারখানা (সালফিউরিক অ্যাসিড, ইস্পাত, গ্লাস, জিঙ্ক ইত্যাদি) থেকে নির্গত ধোঁয়া ধুলো এবং সালফার ডাই-অক্সাইড আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল ঐ ধোঁয়াশার মধ্যে। 1948-এর অক্টোবরে আমেরিকার পেনসিলভানিয়াতেও ঘটেছিল অনুরূপ ব্যাপার। কুড়ি জনের মৃত্যু হয়েছিল সেখানে।

ডিসেম্বর, 1952-তে লণ্ডন দেখেছিল ধোঁয়াশার আর এক ভয়াবহ রূপ। প্রায় তিন সপ্তাহ স্থায়ী এই গাঢ় ঘন, অভূতপূর্ব ধোঁয়াশায় সালফার ডাইঅক্সাইড ছিল মাত্রাতিরিক্ত। ছিল আরও নানারকম ধাতব ও জৈব পদার্থ। ধোঁয়াশা এমন গাঢ় ছিল যে 'নিজের চোখের সামনে ছড়ানো হাতও দেখা যায় না' এবং 'ধবধবে সাদা একটি সার্ট 20 মিনিটেই কালো হয়ে গেল।' প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিনশোর মত মানুষ মারা পড়েছিল শ্বাসকষ্ট এবং আনুসঙ্গিক নানা অসুস্থতায় এবং পথ দুর্ঘটনায়। মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল চার হাজার। 1966'র নভেম্বরে নিউ-ইয়র্কেও সালফার ডাইঅক্সাইড মিশ্রিত ধোঁয়াশা কেড়ে নিয়েছিল 168টি প্রাণ!

ভিয়েতনাম ও সেভেসোর পর আবার একবার ডাই-অক্সিনের কীর্তি ঘোষিত হয়েছিল ব্রাজিলের বিখ্যাত আমাজোন অরণ্যে, 1981-তে। গাছের পাতা ঝরানোর জন্য হেলিকপ্টার থেকে ছড়ানো হয়েছিল ডাই-অক্সিন! পঁচিশ হাজার অরণ্যচারী পশু, বিরল প্রজাতির প্রায় সমস্ত পাখি এবং সাত হাজার মানুষ বলি হয়েছিল মানুষেরই এই অবিমৃশ্যকারিতায়। বোঝা গিয়েছিল, র‍্যাচেল কারসনের 'নীরব বসন্ত' (Silent Spring-R. Carson) বা আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন (স্টকহোম: 1972) কিছুই দেয়নি প্রগতির কারিগরদের।

* * *

দূষণের জাত বিচারে উদ্গীর্ণ পরমাণু শক্তি সবচেয়ে কুলীন, সবচেয়ে অভিজাত। হতে পারে তা পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ, বা পরমাণু-শক্তি কেন্দ্রের দুর্ঘটনা বা অন্য কোনভাবে তেজস্ক্রিয়তার মুক্তি। এবং অন্য অনেক কিছুর মতই এরও সূত্রপাত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে পরমাণু বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষিত হ'লো হিরোশিমা-নাগাসাকির কয়েক লক্ষ মানুষ এবং তাদের পরিবেশ ও ভাবীকালের উপর। প্রতিষ্ঠিত হলো পরমাণু বোমার অমিত শক্তি ও অনন্য বিনাশক্ষমতা। তারপর ভাঁড়ারে জমতে থাকল শত শত পরমাণু বোমা

যাদের তুলনায় হিরোশিমা নাগাসাকির বোমা ছিল আক্ষরিক অর্থেই 'লিটল বয়'! কিন্তু বোমা ও যুদ্ধের কথা থাক। আমরা বরং শান্তির সময়ের কথা বলি!

পরমাণু শক্তির 'শান্তিপূর্ণ' ব্যবহারে' অঙ্গীকারবদ্ধ দেশগুলি বারবার ঘটিয়েছে পরমাণু বোমার (হাইড্রোজেন বোমাসহ) 'পরীক্ষা-মূলক' বিস্ফোরণ! 1954তে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ বিকিনি অ্যাটলে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল চুপিসারে। সাত হাজার বর্গমাইল এলাকা তেজস্ক্রিয়তায় ছেয়ে যায়। পরে হৈ চৈ হওয়ায় কিছুসংখ্যক দ্বীপবাসীর-'গিনিপিগের' চিকিৎসা ও বিকল্প আস্তানা জুটেছিল!···কিন্তু বেশ কিছু বিস্ফোরণের কথা সফল-ভাবে গোপনও করা গেছে বলেই ওয়াকিবহালরা মনে করেন।···বেশ কয়েকবার নিউক্লিয় অস্ত্রবাহী বোমারু বিমান ও সাবমেরিনে 'দুর্ঘটনা'ও ঘটেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পরমাণু বোমাকে সক্রিয় করতে ব্যবহৃত সাধারণ রাসায়নিক বিস্ফোরক ফাটলেও শেষ পর্যন্ত পরমাণু বোমা ফাটেনি। তবে আরও ভয়ের কথাটি বোধহয় পরমাণু অস্ত্র বা বোমার হারিয়ে যাওয়া। না-ফাটা গুটিকয়েক পরমাণু বোমার কোন হদিসই নাকি পাওয়া যায় নি!

থ্রি মাইল আইল্যান্ডের (আমেরিকা, 1979) পরমাণু চুল্লীর দুর্ঘটনা অবশ্য বহুবিদিত। চুল্লীর শীতক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে চুল্লী কেন্দ্র গলে গিয়েছিল। দুর্ঘটনায় কোন মানুষ মারা পড়ে নি। একথা জোর গলায় বার বার প্রচার করা হয় কিন্তু ঘন্টা-তিনেকের মধ্যে পঁচিশ হাজার মানুষকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, কোন আশঙ্কায় তা চেপেই যাওয়া হয়।

আশঙ্কাটা অবশ্য উলঙ্গভাবে প্রকাশ্যে এসে পড়ে চের্ণোবিলে (রাশিয়া, 26 এপ্রিল, 1986)। পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রায় অকেজো করে ফেলা হয়েছিল, তাকে আর কেজো করে তোলার সুযোগ মেলেনি। মধ্যরাত্রে ঘটেছিল বিস্ফোরণ। চুল্লীর এক হাজার টনের স্টীলের ঢাকনা উড়ে, দশ ফুট পুরু কংক্রীটের দেওয়াল গুঁড়িয়ে গলিয়ে একের প[redacted]ক বিস্ফোরণ আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মত উগরোতে থাকে তেজস্ক্রিয় জ্বালানী ও ভস্মরাশি। পাঁচ হাজার টন বোরন, সীসা ডলোমাইটের স্তূপেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যায় নি বারো দিনের আগে। হাজার হাজার টন কংক্রীটের নীচে কবরে শয়ান আছে চের্ণোবিল ও তার চুল্লী। তিনশো বর্গমাইল এলাকা থেকে 135000 মানুষকে সরিয়ে নিয়েও নিস্তার নেই। মাত্রই 31 জনের মৃত্যুর মধ্যেও শ্লাঘার অবকাশ নেই কিয়েভ তথা রাশিয়া কিংবা গোটা পৃথিবীর। কত লক্ষ দুরারোগ্য ক্যানসার হতে পারে, কত ধরণের জেনেটিক বৈকল্য ঘটতে পারে কিংবা কতদিন ধরে কত বিকলাঙ্গ 'হিবাকুশা' জন্ম নিতে পারে—সে হিসেব এখনও উন্মুক্ত। □

রবীন মজুমদার

কয়েকদিন আগে অবধি খবরের কাগজের শিরোনামা অধিকার করে ছিল প্লেগ। এখন প্রকাশিত হচ্ছে মণিপুর ও রাজস্থানে ম্যালেরিয়ার তান্ডবের কথা। পশ্চিমবঙ্গও বাদ যাচ্ছে না। সর্বত্রই নাগরিকদের স্বাস্থ্যের অধিকার প্রায় শূন্যে গিয়ে ঠেকছে। আমরা চাই মানুষজন এই ভয়ংকর স্বাস্থ্যচিত্র সম্পর্কে ভাবুন, সচেতন হোন এবং একে পাল্টানর জন্য সক্রিয় হোন। জনস্বাস্থ্য নিয়ে আপনার মতামত বা কোন রিপোর্ট বি ও বি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। লেখা পাঠান পত্রিকার যোগাযোগের ঠিকানায়।

ফসলের জীনগত বৈচিত্রের বিলুপ্তি

একটি পর্য়ালোচনা

1

'জীন' শব্দটি শিক্ষিত শহুরে মানুষের কাছে আজ আর অপরিচিত নয়। এই সংক্রান্ত বিভাগ জেনেটিক্স এখন জীববিজ্ঞানে অন্যতম সম্মানীয় শাখা হিসাবে স্বীকৃত। আমরা দেখছি প্রচার মাধ্যম এবং বিশেষ করে নানান রঙচঙে পত্রিকা জীন প্রযুক্তি এবং জীনগত পরিবর্তনের ক্ষমতা নিয়ে এমন ভাবে প্রচার করছে যেন সোনা ফলানোর যাদুকাঠি আমাদের হাতে এসে গেছে। আসলে কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানীরা পাবলিকের জন্য প্রচার করলে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে বেশ পুলক লাগে, এবং সেই তত্ত্ব-প্রযুক্তি ও পরিভাষাকে ঘিরে গড়ে ওঠে অপার বিস্ময়, সম্ভ্রম ও কৌতুহল। নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি ও শক্তিকেন্দ্র নিয়েও এমনটা প্রচুর ঘটেছে যদিও এখন অনেকেই বুঝেছেন যে এটা হল প্রথম বিশ্বে খারিজ হয়ে যাওয়া এক বিপজ্জনক জনস্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তি এবং সেই বাতিল প্রযুক্তি এদেশে বিক্রি করার জন্যই এর সপক্ষে এত ঢক্কা-নিনাদ। সন্দেহ হয় জীন প্রযুক্তি নিয়েও একই ব্যাপার ঘটছে কি না ?

আপনি যদি আনন্দমেলা, দেশ বা সানন্দার মত বাজারী পত্রিকাগুলি দেখেন তবে দেখবেন যে এরা নানান লেখার মাধ্যমে জীন ও জীন প্রযুক্তির ক্ষমতাকে কি ভাবে সর্বশক্তিমান হিসেবে দেখায়। ফলে মেয়ে পরীক্ষায় প্রথম হলে বাবা গোঁফের ফাঁকে হেসে বলতেই পারেন 'এসব আমাদের জীনে আছে'। বিয়েটিয়ের সময়ও জীনগত বিশুদ্ধতার কথা উঠতেই পারে। জীন প্রযুক্তি নিয়ে পপুলার সাইন্সের' লেখা পড়লে মনে হয় জীব প্রযুক্তিবিদদের অসাধ্য বোধহয় কিছুই নেই। ইচ্ছেমত জীন তৈরী করা অথবা একটি জীব থেকে জীন নিয়ে অন্য জীবে সঞ্চারিত করা যেন নেহাতই মামুলি ব্যাপার। ভয় হয় 'জীন' যেন আবার এক আধুনিক ধর্মীয় শব্দ না হয়ে ওঠে। তাই জীনতত্ত্ব নিয়ে এই সমস্ত কুসংস্কারগুলিকে আগে কাটানো দরকার।

2

সহজভাবে বলতে গেলে কোন জীবের বিভিন্ন শরীর ও দেহগত বৈশিষ্ট্য যেমন উচ্চতা, গায়ের রঙ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, উচ্চফলনশীলতা ইত্যাদি প্রত্যেকটি জীবকোষে অবস্থিত এক বা একাধিক জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জীনগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে যায়। এই নিয়মগুলি ঠিক মত জানতে পারলে একই প্রজাতির বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন সদস্যদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে সেই বিভিন্ন গুণগুলিকে পরবর্তী প্রজন্মে একত্রিত করা যেতে পারে! যেমন ধরা যাক একটি ধানের ফলন খুব বেশী অপর একটি ধানের চাল বেশ সুগন্ধি। তাহলে এই দুই ধরনের ধানের মধ্যে ক্রস্ করে এমন

ধান তৈরী করা যেতে পারে যা একই সাথে সুগন্ধি ও উচ্চফলনশীল। একই ভাবে বিভিন্ন ধানের বিভিন্ন গুণ যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, নোনা মাটিতে বেঁচে থাকার ক্ষমতা বন্যা সহ্য করার ক্ষমতা, ইত্যাদিকে একত্র করা যেতে পারে। এখনও পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন গুণের জন্যে দায়ী জীন সমূহকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একত্রিত করতে পারে। কিন্তু কখনই কোনো নতুন জীন সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন ধরুন কেউ যদি এমন ধান তৈরী করতে চায় যা একই সাথে মাজরা পোকা ঠেকাতে পারবে ফলন বেশী হবে আবার নোনামাটিতে বেঁচেও থাকতে পারবে তাহলে তাকে অবশ্যই ওই সমস্ত গুণগুলি আছে এমন বিভিন্ন ধরণের ধান সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের ওই গুণের জন্যে দায়ী জীনকে একত্র করতে হবে। কোনো একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন ধান যদি একবার বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে কোনোদিনই সেই গুণের নিয়ন্ত্রক জীনসমূহ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন ধরুন ধ্বসারোগ ঠেকাতে পারে যে সমস্ত ধান সেগুলি যদি লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে কোনো-দিনই এমন সংকর ধান তৈরী করা যাবে না যাতে ধ্বসারোগ ঠেকাবার ক্ষমতা আছে। শুধু ধানের ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া হল কিন্তু একথা সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রেই সত্য। আর একটা কথা বলা দরকার যে কোনো জীনের কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হবে কি হবে না তা অনেকটাই নির্ভর করে পরিবেশের উপর। যেমন যে উচ্চফলনশীল বীজগুলি এখন চাষ করা হয় সেগুলিতে প্রচুর সার এবং জল দেওয়া দরকার। সেগুলিকে এমন জমিতে চাষ করতে হবে যেখানে জল দাঁড়িয়ে যায় না খরা বা বন্যার প্রকোপ নেই এবং মাটি নোনা নয়। এইসব পরিবেশ ঠিক করতে পারলে তবেই তার থেকে উচ্চফলন পাওয়া সম্ভব, নয়তো নয়। বর্তমানে রাসায়নিক সারের দাম এবং বিঘা প্রতি চাহিদা, কীটনাশক ও শ্যালো পাম্পের ভাড়া (17 30 টাকা / ঘণ্টা) অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বহু দরিদ্র চাষী উপযুক্ত সার, কীটনাশক ও জল ছাড়াই এই ধানগুলি চাষ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে দেশী ভ্যারাইটি গুলির থেকেও ফলন অনেক কম হচ্ছে। [জীন সম্পর্কে আর একটা কথা বলে আমরা মূল বিষয়ে প্রবেশ করবো একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বিষয়টা বলছি কারণ জীন-ঘটিত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এটা বলা দরকার। মানুষের বুদ্ধিমত্তা, মনন এবং সাংস্কৃতিক কৃষ্টি জীন-নিয়ন্ত্রিত নয় বরং সম্পূর্ণভাবেই পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত। তাই যারা বলে ইউরোপীয়রা বা ব্রাহ্মণরা বেশী বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন কারণ তাদের দেহকোষে সেই জীনগুলি আছে তারা মিথ্যাবাদী এবং শোষক শ্রেণীর ভাড়াটে জীববিজ্ঞানী। সংস্কৃতি ও মননের বিকাশের জন্যে দরকার একটা সুস্থ পরিবেশ আর মানুষই পারে তার পরিবেশকে পাল্টাতে।]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে উচ্চফলন-শীল ফসল তৈরী করতে গেলে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন ভ্যারাইটিগুলি সংরক্ষিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ফসলের বিভিন্ন ভ্যারাইটি সারা পৃথিবী জুড়ে সমান ভাবে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানী ভ্যাভিলভ (Vavilov 1935) বিভিন্ন ফসলের ভ্যারাইটির আটটি উৎপত্তিস্থল সনাক্ত করে ছিলেন। এই অঞ্চল-গুলিতেই কতকগুলি নির্দিষ্ট ফসল প্রথম চাষ শুরু হয় এবং এই ফসল গুলির সর্বাধিক ভ্যারাইটি এই অঞ্চল-গুলিতেই পাওয়া যায়। এই আটটি অঞ্চল হল যথাক্রমে।

1. চীন
2. ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
3. মধ্য এশিয়া
4. এশিয়া মাইনর
5. ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল
6. ইথিওপিয়া
7. মেক্সিকো
8. আন্দিজ অঞ্চল, চিলি ও আমাজন

এই আটটি অঞ্চলের মধ্যে চীন এবং ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রথম ধান চাষ শুরু হয়। ফলে এই সব

অঞ্চলগুলিতে ধানের বিভিন্ন ভ্যারাইটি গুলি পাওয়া যায়। এই সমস্ত অঞ্চল জুড়ে প্রায় লক্ষাধিক ধানের ভ্যারাইটি ছিল। এই ভ্যারাইটিগুলির বহু আশ্চর্য গুণ আছে, হাতের কাছের দু একটা উদাহরণ নিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। যেমন ধরা যাক পান্‌তারা ধানের কথা। হুগলী জেলার গ্রামগুলিতে সার্ভে করতে গিয়ে আমরা এই ধানটির সন্ধান পাই। জমি আট ফুট জলের তলায় চলে গেলেও এই ধানের মাথা জল ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে কিন্তু ধান গাছ একটুও হেলে পড়ে না। ধানের ফলন বিঘা প্রতি তের মনের কাছাকাছি। অন্যান্য ভালো ধান যেমন মেঘ ইত্যাদি, জমিতে অতিরিক্ত জল জমার ফলে যদি খুব বেশী লম্বা হয়ে যায় তাহলে ক্ষেতে ঢলে পড়ে যায়, ফলে ফলন নষ্ট হয়। জলা জমিতে চাষ করার পক্ষে পান্‌তারা সেদিক থেকে আদর্শ। ধানটি হুগলীর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও আমরা দেখিনি। অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকেরা ধানটির খবর জানেন না হয়ত। তবে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশে জলা ও নিচু জমিতে ধানটিকে সাফল্যের সাথে চাষ করা যাবে। জলা জমিতে চাষের একটি সুবিধা হল জমি ক্ষারীয় বা আম্লিক (টোকো জমি) যাই হোক না কেন জমিতে জল জমে গেলে তার ক্ষারকত্ব বা অম্লত্ব কিছুই থাকেনা। তাই যে সমস্ত জমিতে উচ্চফলনশীল ধান চাষ করা সম্ভব নয় বা করা গেলেও তা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ সেখানে ওই ধরণের সুবিধাজনক দেশী ভ্যারাইটি চাষের সুযোগ আছে। এছাড়া আমরা দেখেছি কালোঝাঁঝি ধান। কোনো কীটনাশক ছাড়াই ওই ধান দিব্যি চাষ করা যায় কারণ ওতে পোকা লাগেনা। ওই ধানে কীটনাশক প্রয়োগ করলেই বরং ধানগাছ মরে যায়। সুগন্ধি ধানগুলি যেমন গোবিন্দ-ভোগ, বাসমতি, আমন এদের কথা তো সকলেই জানেন। ভারতের গুজরাটে কাম্পা বলে একটি ধান পাওয়া যায় যা সমুদ্রের লবণাক্ত জল সহ্য করেও বেঁচে থাকে। এই ধান সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ করে দেখা যেতে পারে। একই ভাবে মধ্য এশিয়া বা এশিয়া মাইনরে গমের অথবা দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ অঞ্চলে আলুর বহু আশ্চর্য গুণ সম্পন্ন ভ্যারাইটি পাওয়া যায়।

সবুজ বিপ্লবের জন্যে যে উচ্চ ফলনশীল ধানগুলি এদেশে চাষ শুরু হল সেগুলি সবই খর্বাকৃতি, কোনোটাই 2-2½ ফুটের বেশী উঁচু নয়। এই খর্ব আকৃতির নিয়ন্ত্রক জীনটিকে সংগ্রহ করা হয় তাইওয়ানের ডি-জিও-উ-গেন (Dee-Geo-Woo-Gen) নামক ভ্যারাইটি থেকে খর্বাকৃতি হবার দরুণ এরা রাসায়নিক সারের প্রতি বেশী সংবেদনশীল হয়। সাধারণ দেশী ধানগুলিতে বেশী রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে সমস্ত গাছটারই বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু উচ্চফলনশীল ভ্যারাইটিগুলি খর্বাকৃতি হবার দরুণ গাছের একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পর সারের সমস্তটাই বীজের ওজন বাড়াবার কাজে লাগে। এছাড়া উচ্চফলনশীল (এইচ ওয়াই ভি) ধানের পাতা চওড়া হবার দরুণ এদের সালোক সংশ্লেষের হারও বেশী হয়। এটাও ফলন বাড়বার একটি কারণ। এই এইচ ওয়াই ভি ধান আসবার পর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ একর জুড়ে এই ধান চাষ শুরু হয় ফলে বহু দেশী ভ্যারাইটির চাষ বন্ধ হয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর ধরে এদের চাষ বন্ধ থাকার দরুণ এরা লুপ্ত হতে শুরু করে। কারণ বিশেষ ভাবে সংরক্ষণ না করলে ধানের বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা একবছরের বেশী থাকেনা। এইভাবে বহু আশ্চর্য গুণ সম্পন্ন ধান বিলুপ্ত হতে থাকে। ওই একই ঘটনা গম, আলু ভুট্টা ইত্যাদি ফসলের ক্ষেত্রেও ঘটতে শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলি, অল্পদিনের মধ্যেই এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়, কারণ এই দেশী ভ্যারাইটিগুলি লুপ্ত হয়ে গেলে তাদের পক্ষেও আর নতুন ভ্যারাইটির বীজ তৈরী করা সম্ভব নয়। ফলে লাটে উঠবে রমরমা বীজের ব্যবসা। তাই 1974 সালে ফোর্ড এবং রকফেলার ফাউণ্ডেশন—ইন্টার-ন্যাশনাল বোর্ড অফ প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস বা আই

বি পি জি আর গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। আই বি পি জি আর বিভিন্ন ভ্যারাইটির ফসলের বীজ বা জার্ম'প্লাজম সংগ্রহ শুরু করে। ভ্যারাইটির উৎপত্তিস্থলগুলিতে তারা জার্ম'প্লাজম সংগ্রহের কেন্দ্র স্থাপন করে। 1974—1986 সাল পর্যন্ত আই বি পি জি আর প্রায় 1,30,000 জার্ম'প্লাজম সংগ্রহ করে। যেহেতু বিভিন্ন ফসলের আটটি উৎপত্তি স্থলের মধ্যে সাতটিই তৃতীয় বিশ্বে অবস্থিত, তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই সংগ্রহের 91% আসে 'অনুন্নত' দেশগুলির থেকে। আই বি পি জি আর স্বভাবতই সেই সমস্ত দেশী ভ্যারাইটিগুলিই সংগ্রহ করে যেগুলি থেকে বিভিন্ন লাভজনক উচ্চফলনশীল ভ্যারাইটি তৈরী করা যাবে। [তৃতীয় বিশ্বের জীন সম্পদ লুঠ করার জন্যে আই বি পি জি আর রীতিমত বেয়াদপি শুরু করেছিল।] এদের জার্ম'প্লাজম সংগ্রহের কেন্দ্রগুলির ওপর ইউ এন ও ইত্যাদি কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা, এমন কী যেসব দেশে এদের কেন্দ্রগুলি অবস্থিত সেই সব দেশের জাতীয় সরকার ইত্যাদি সকলেরই কর্তৃত্ব অস্বীকার করা হয়। কথা ছিল যে এই জার্ম'প্লাজম সংগ্রহের একটি সেট থাকবে উৎপত্তি স্থলের দেশগুলির কাছে আর একটি সেট থাকবে আই বি পি জি আর-এর কাছে। কিন্তু ফোর্ড বা রকফেলার তৃতীয় বিশ্বকে পাত্তা দেবে এটা আশা করাই বাকুলতা, স্বাভাবিক ভাবেই এই সংগ্রহের একটা সামান্য অংশ তৃতীয় বিশ্বকে ছুঁইয়ে দিয়ে এই জীন-ডাকাতেরা কেটে পড়ে। এই জার্ম'প্লাজমগুলিকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার জীন ব্যাঙ্কে সংরক্ষণ করা হয়। যেমন ফিলিপাইনসের লাস-বানোসের (Las Banos) জীন ব্যাঙ্কে প্রায় 86,000 ধানের ভ্যারাইটি অতি শীতল তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে সংরক্ষণ করা আছে। তৃতীয় বিশ্বের জীন সম্পদ লুঠ করার পর বহুজাতিক কোম্পানিগুলি কোটি কোটি টাকার বীজের ব্যবসায় নেমে পড়ে। বিভিন্ন দেশীয় ভ্যারাইটির মধ্যে সংকরায়ন ঘটিয়ে অথবা জীন ক্লোনিং ইত্যাদি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জীনগুলিকে একত্রিত করে তৈরী করা হয় উচ্চফলনশীল এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন উন্নত ভ্যারাইটি।

এক কথায় পরিস্থিতিটা এই রকম যে সবুজ বিপ্লবের ফলে তৃতীয় বিশ্বের ফসলের ভ্যারাইটির সংখ্যা ক্রমশ কমছে। যেমন শ্রীলঙ্কার চাষীরা সবুজ বিপ্লবের আগে প্রায় 2,000 ভ্যারাইটির দেশী ধান চাষ করতেন, কিন্তু বর্তমানে চাষ করা হয় মাত্র 5টি। ভারতে এক সময় 30,000 ভ্যারাইটির ধানের চাষ করা হত। কিন্তু বর্তমানে মোট উৎপাদিত ধানের 75%-ই আসে 10 টিরও কম ভ্যারাইটি থেকে। পশ্চিমবঙ্গের পান্‌তারা, কালোঝাঁঝি, রঘুসাল, ঝিঙেসাল ইত্যাদি ধানগুলি লুপ্তির পথে। আমরা দেখেছি বর্তমানে খুব সামান্য পরিমাণ জমিতেই এগুলি চাষ হয়, হয়তো আর কয়েক বছর পর এগুলিও লুপ্ত হয়ে যাবে। তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশের চাষীদের উচ্চফলনশীল বীজগুলির উপর নির্ভরতা ক্রমশ বাড়ছে। বীজগুলি ভালো বা মন্দ যাই হোকনা কেন, এগুলি চাষ করলে লাভ বা ক্ষতি যাই হোকনা কেন, চাষীরা এগুলি চাষ করতে বাধ্য কারন এগুলি ছাড়া অন্যান্য ভ্যারাইটিগুলি ক্রমশই বিলুপ্তির পথে। তাই বীজের কোম্পানীগুলি যেমন খুশি বীজের দাম বাড়ালে বা যেকোনো শর্ত প্রয়োগ করলে আমরা তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবো কারণ এদের দেওয়া বীজ না পেলে চাষ সম্ভব হবেনা। 1 নং তালিকায় কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানী ও তাদের বিক্রি করা বীজের পরিমাণ উল্লেখ করা হল। 2নং তালিকায় কয়েকটি উচ্চফলনশীল ও দেশী বীজের বাজারদর দেওয়া হল।

ধানের মত এই সমস্যা এখনই খুব একটা স্পষ্ট না হলেও সব্জি বীজের ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়ছে। টমাটো বাঁধাকপি, ফুলকপি, ঢেঁড়স, মটরশুঁটি ইত্যাদি যাবতীয় ফসল সাম্রাজ্যবাদী

তালিকা নং 1

বহুজাতিক কোম্পানী	বিক্রি করা বীজের পরিমাণ (মিলিয়ন ডলারে)
রয়াল ডাচ / শেল (Royal Dutch / Shell)	84,965
কারগিল (Cargill)	30,000
ভলভো (Volvo)	10,518

তালিকা নং 2

শষ্যের নাম	প্রকৃতি	কোম্পানি	দাম (টাকায় প্রতি 500 গ্রামের)
বাঁধাকপি	ড্রামহেড ও. পি.	অলসেনস, এন্ কে	280
বাঁধাকপি	দেশী (1নং বেটে)	বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ এন্ড কোং	105
বাঁধাকপি	রেফরেবল এফ ওয়ান	কানেকো জাপান	550
ফুলকপি	স্নোবল আর্লি ও. পি.	অলসেনস এন্ কে	750
ফুলকপি	দেশী (পৌষালী)	বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ এন্ড কোং	125
মুলা	আর্লিদর	হ্যাং নং কোরিয়া	190
মুলা	দেশী (কাল পিনলাল)	বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ এন্ড কোং	60
ঢেঁড়স	দেশী (পুষা শ্রাবণী)	বি পি ঘোষ এন্ড কোং	14
ঢেঁড়স	এইচ ওয়াই ভি	ইন্দো আমেরিকান	540 (প্রতি 1 গ্রাম)

সংস্থার বীজে চাষ করা শুরু হয়েছে। এই উচ্চফলনশীল বীজগুলি এফ ওয়ান প্রজন্মের হওয়ায় ফসল ফলবার পর তা থেকে নতুন করে বীজ তৈরী সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকবার চাষের সময় এই বীজগুলি চাষীরা কিনতে বাধ্য থাকছেন। বীজগুলির দামও তাই লাগাম ছাড়া (তালিকা নং 2 দ্রষ্টব্য)। আলুচাষের ক্ষেত্রে সমস্যা ক্রমশ একটা মারাত্মক আকার নেবে। অতি সম্প্রতি ডানকন কোম্পানী এক বিশেষ ধরনের আলু বীজ বাজারে ছাড়বার আয়োজন করেছে। এই আলুর বীজ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রচারিত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত আলুর থেকে যে "কল" বা অঙ্কুর বের হত সেগুলিকে মাটিতে বপন করেই চাষ হত, কিন্তু এবার সরাসরি বীজ থেকে আলু গাছ হবে। এই ধরনের আলু-গাছের আলু থেকে কল বেরবে না। তাই প্রত্যেকবার চাষিকে চাষের জন্যে বীজ কিনতে হবে। এই বীজ আলুর চাষ শুরু হবার কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় আলুর ভ্যারাইটি লুপ্ত হয়ে যাবে। আলু চাষের জন্যে চাষী তখন বাধ্য থাকবে যে কোনো মূল্যে এই বীজ আলু কিনতে।

এবার আমরা সমস্যার জটিলতাটা বোঝার চেষ্টা করবো। আপাতভাবে জীন সম্পদ লুণ্ঠন প্রাচীন সাম্রাজ্য-বাদী শোষণেরই এক নতুন সংস্করণ। এক্ষেত্রেও উপনিবেশগুলিকে কাঁচামাল

বা জার্ম'প্লাজমের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং এই জার্ম'প্লাজম ব্যবহার করে যে উন্নতমানের হাইব্রিড ভ্যারাইটি তৈরী করা হচ্ছে সেগুলিও তৃতীয় বিশ্বের বাজারেই বিক্রী করা হচ্ছে। যেমন সবুজ বিপ্লবের সময় পাঞ্জাবে যে উচ্চফলনশীল খর্বাকৃতি ধানের ভ্যারাইটিগুলি ব্যবহার করা হয় তার প্রত্যেকটিই চীন, ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশী ভ্যারাইটিগুলির মধ্যে সংকায়ণ করে তৈরী করা (তালিকা নং 3 দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের পূরণ করতে। সমস্যা কি তাতে মিটবে? উত্তর হল—না। কারণ বিভিন্ন ফসলের ভ্যারাইটিগুলি যদি এই উপমহাদেশ থেকে লুপ্তই হয়ে যায়, তার জার্ম'প্লাজম যদি আমাদের হাতে নাই থাকে তাহলে বায়োটেকনোলজির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়েও আমরা এই উচ্চফলনশীল বীজ তৈরী করতে পারব না। কারণ বায়োটেক-দিয়ে ইচ্ছামত নতুন বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক জীন তৈরী করা সম্ভব নয়, বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন জীনগুলিকে প্রয়োজন মত একত্রিত করা যায় মাত্র।

তালিকা নং 3

উচ্চফলনশীল ভ্যারাইটি	জনিতৃ উদ্ভিদ	পাঞ্জাবে ব্যবহারের বছর
তাইচুং নেটিভ 1	ডি জি ডব্লু জি × সাই ইউয়ান চুং	1966
আই আর 8	পি আর টি এ × ডি জি ডব্লু জি	1968
জয়া	টি (এন) × টি 141	1971
আর পি 5-3 (সোনা)	জি ই বি 24 × টি এন 1	1972
পালমন 579	আই আর 8 × তাদুকান	1972
পি আর 106	আই আর × পেটা 5 × বেলা পাটনা	1976

তথা আমাদের দেশের ফসলের জীনগত বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি আমাদের এক নতুন বিপদের মুখোমুখি করেছে। ধরা যাক এক সুন্দর ভবিষ্যতে আমরা এই সমস্ত কোম্পানীগুলিকে তাড়ালাম। এদের সমস্ত পুঁজি বাজেয়াপ্ত করলাম। এবং জোর চেষ্টা করলাম জীন প্রযুক্তিতে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তাকে

জীন নিয়ে যারা দুনিয়া জোড়া ব্যবসা ফাঁদছে তাদের বাণিজ্যের নোংরা কলাকৌশল বা ধনী রাষ্ট্রের সরকারের ভূমিকা এখানে আমরা হয়ত ভাল করে ব্যাখ্যা করতে পারলাম না তবে শেষ করতে গিয়ে এটুকু বলব যে সমস্ত নিপীড়িতদের স্বার্থ রক্ষাকারি শক্তিগুলির এই বিপদের গুরুত্ব বোঝা

উচিত। কৃষক তথা নাগরিক সংগঠন-গুলি উদ্যোগ নিলে সফলভাবে জীন সম্পদ সংরক্ষণ সম্ভব। যে সমস্ত বিদেশী সংস্থা এই উপমহাদেশের জীন সম্পদ লুন্ঠন করতে চাইছে তাদের প্রতিহত করতে এগিয়ে আসতে হবে। নানান দেশে এ নিয়ে চেষ্টা চলছে। মেক্সিকো এবং নিকারাগুয়াতে জীন সম্পদ সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জীন ব্যাঙ্ক গঠনের আন্দোলন শুরু হয়েছে। কয়েক বছর আগে ইন্টার-ন্যাশনাল পোটাটো সেন্টার আলুর বিভিন্ন ভ্যারাইটির সন্ধানে পেরুতে এক অভিযান চালায়। কিন্তু এই কাজে তারা তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে। আমাদের দেশে কারগিল কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে কর্ণাটকের কৃষকদের আন্দোলনও উজ্জল উদাহরণ। আগামী দিনে এই পথেই আমাদের এগোতে হবে। □

কালমেঘ মণ্ডল

★ তথাসূত্রের জন্য বি ও বি-র ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তৃতীয় বিশ্বই লক্ষ্য—কেন ?

গত তিনদশক ধরে তৃতীয় বিশ্বের মহিলাদের কল্যাণে উঠে পড়ে লেগেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউ এস এইড, ইউ এন এফ পি এ ইত্যাদির মত সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান। এদের সব কথারই শেষ কথা—জনসংখ্যা কমাও। বাজারী অর্থনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের মহিলাদের জরায়ু এখন সবচাইতে বড় মূলধন। একে সামনে রেখে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করা যায়, আনা যায় বাজারে নিত্য নতুন ক্ষতিকারক কনট্রাসেপ্‌টিভ। 'দরিদ্র', 'অশিক্ষিত' 'অসচেতন' মহিলা যারা নিজস্ব ফার্টিলিটি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম—তাদেরকে গিনিপিগ করে নব নব কনট্রাসেপ্‌টিভের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তার বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্ব থেকে লুটে নেওয়া যায় শত-কোটি ডলার। অবশ্য এই লুটপাটের রাজত্বকে পিছনে রেখে ধনী উন্নত দেশগুলো মুখোশের মধ্যে দিয়ে যে অপপ্রচারটা চালাচ্ছে তা হল—তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধিই দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ। এখানকার রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনুন্নয়ন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নিরন্নতা, এ সব কিছুর জন্যই নাকি আসলে দায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ফলে মহিলাদের গর্ভকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের 'আলো'র পথে পৌঁছে দিতে এসেছে একাধিক বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী।

কেন এত নিরন্ন মানুষ ?

'60 এর দশক থেকেই ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং জনবিস্ফোরণ এই তিনটে শব্দকে সমার্থক ভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। ফলে জনকল্যাণের আড়ালে সেই সময় থেকেই এই তিনের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে ধনী দেশের একাধিক বহুজাতিক সংস্থা। ক্ষুধা দূর করতে কৃষিতে এল উচ্চ-ফলনশীল বীজ, এবং তারই হাত ধরে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার। কৃষির এই বাণিজ্যিকীকরণ আসলে কমিয়ে দিল জমির উর্বরতা, এবং সেই সঙ্গে মোট খাদ্যশষ্য উৎপাদনের পরিমাণও। বন্ধ্যা জমিকে উর্বর করতে এল আরও আরও সার এবং কীটনাশক। আর এইভাবেই উন্নত ধনী দেশগুলোর বহুজাতিক সংস্থাগুলো তৃতীয় বিশ্বে পেয়ে গেল একটা স্থায়ী কৃষি বাজার। উচ্চফলনশীল বীজ, সার এবং কীট-নাশক আসলে গ্রামীণ দারিদ্র্যকে আরও বাড়িয়েছে, কারণ এতদিন ধরে চলে আসা দেশীয় বীজধানের ব্যবহার কমায় তাকে মূলতঃ নির্ভর করতে হয়েছে আমদানির ওপর—যেটা আসলে উৎপাদন মূল্যকেই বাড়িয়েছে। এদেশে সবুজ বিপ্লব জমির দাম করেছে আকাশ ছোঁয়া এবং ছোট চাষী ক্রমশঃ পরিণত হয়েছে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে। কৃষি ব্যবস্থার ওপর মূলতঃ নির্ভরশীল তৃতীয় বিশ্বে বেড়েছে অপুষ্টি, অনাহার, দারিদ্র্য, বেকারী। যদি উন্নয়নশীল দেশগুলো যে পরিমাণ খাদ্যশষ্য উৎপন্ন করে তার সবটাই নিজেরাই ভোগ করতে পারত তাহলে তৃতীয় বিশ্ব থেকে অনেক আগেই দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি ইত্যাদি শব্দগুলো মুছে যেত। আসলে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি যখন

তৃতীয় বিশ্বে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করল তখন তৃতীয় বিশ্বই হল কাঁচা-মালের সরবরাহকারী এবং ধনী দেশ ব্যবহারকারী। আফ্রিকায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং খরা থাকলেও সেখান থেকে খাদ্যশষ্য আমদানির পরিমাণ কিন্তু বেড়েই চলে। আমেরিকানদের খাবার টেবিলে স্ট্রবেরী এবং টমাটো সরবরাহ করতে মেক্সিকানদের নিজস্ব খাবার বিন, চাল, ভুট্টার ফলন কমিয়ে ফেলতে হয়। এ যাবৎ আফ্রিকার গড় আয় বাড়ে তো নিইই বরঞ্চ 25% কমেছে। পেরুতে 1981-র তুলনায় 1991তে এক কিলো চালের দাম তুলতে কৃষককে খাটতে হয় 9 গুণ বেশী। এবং '60-র দশকের পর ব্রাজিলকে মূল খাদ্যশষ্য উৎপন্ন করতে খাটতে হয় ৪ গুণ বেশী। এরকম উদাহরণ এক নয়—আছে একাধিক। রপ্তানী-নির্ভর তৃতীয় বিশ্ব আজ সর্বস্বান্ত, ঋণের ভারে ন্যুব্জ। এ যেন সেই 'নীলদর্পণ' নাটকের ঘটনা, নিজেরই জমিতে চাষী বাধ্য ধানের বদলে নীল বুনতে। তবে এখন আর সাহেবের চাবুক নেই—আছে 'আধুনিকতা', 'উন্নতি', 'প্রগতির' তকমা।

নিরন্নতার জন্য দায়ী কে—জনসংখ্যা বৃদ্ধি না অসাম্য ঃ

1989-90 সালের থার্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট গাইড বলছে যে 20 বছরে বিশ্বের খাদ্যশষ্য উৎপাদনের হার বেড়েছে 3% কিন্তু জনসংখ্যা বেড়েছে 2%। আসলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিন্তু কমছে 1974 সাল থেকেই। 1984 সালের ওয়ার্ল্ড পপুলেশন প্ল্যান অফ এ্যাকশন-এ বলা হয়েছে গত দশবছরে জনসংখ্যা কমলেও অধিকাংশ দেশেই কিন্তু দারিদ্র্য, বেকারী, এবং বিদেশী ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। এ তো হবার কথা নয়, তবে কেন এমন হয়! খুঁটিয়ে দেখলে জানা যায় সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র 5% জনসংখ্যার দেশ আমেরিকা বিশ্বের $\frac{1}{3}$ অংশ নন রিনিউএবল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও কাজের $\frac{1}{4}$ অংশ ভোগ করে। এদেশের একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় একজন সাধারণ আমেরিকান নাগরিক প্রায় 300 গুণ বেশী শক্তি খরচ করে। এত সম্পদ আসে কোথা থেকে? কেন, কাঁচামালের যোগানদার ঋণ ভারে জর্জরিত তৃতীয় বিশ্ব তো আছেই। আমরা এও দেখেছি বুশ প্রশাসন এবং তার ধামাধরা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো 'শক্তির' বিশেষতঃ কম মূল্যে তেলের সরবরাহ বজায় রাখতে মারাত্মক পরিবেশ দূষণকারী উপসাগরীয় যুদ্ধও বাধিয়ে দিতে পিছপা হয় না। প্রাকৃতিক সম্পদের এই অপ্রাচুর্যের যুগে বিশ্বের প্রতিটি মানুষই যদি খেতে-পরতে পায়, তাহলে ধনী দেশগুলোর একেক জনের জন্য 2-3 খানা গাড়ী, বাড়ী, ইত্যাদি জুটবে কেমন করে? তৃতীয় বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা এবং নিজেদের বিলাসিতাময় জীবন যাপন চলবে কি করে?

ধনী দেশের আর এক চাপানো নীতি—জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ

উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা সমস্যা যখন উন্নত ধনী দেশ-গুলোর নিরাপত্তার স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত, তখন নতুন উপায়ে জেনোসাইডের ঘটনা আশ্চর্য কিছু নয়। এই জেনোসাইড আসছে মূলতঃ মহিলাদের গর্ভকে কেন্দ্র করে—নিত্য নতুন বিপজ্জনক গর্ভনিরোধকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-প্রচলন, বাজারীকরণ সব কিছুর মধ্য দিয়েই। 1991 সালে প্রকাশিত ইউ এন এফ পি এ-র (ইউন্যাইটেড নেশনস্ ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ্যাকশন) এক রিপোর্টে গর্ভনিরোধকের মাধ্যমে মহিলাদের বন্ধ্যাত্বকরণ প্রক্রিয়াকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে 2000 সালের মধ্যে এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের 15 কোটি 20 লক্ষ মাকে এবং পানামা ও পোর্টোরিকোর 80% সন্তানজন্ম-দানকারী মা-কে নিবীজকরণ করা হবে। তা সে পদ্ধতি নরপ্ল্যান্ট থেকে শুরু করে নেট্-এন, ডিপো প্রভেরার মত যত ক্ষতিকারক গর্ভনিরোধকই হোক

না কেন। তাই ধনী দেশগুলোর বিভিন্ন তথাকথিত উন্নয়নমূলক সাহায্যের আড়ালে সর্বদাই একটা কথা লুকিয়ে থাকে—জনসংখ্যা কমাও। বাংলাদেশের মত দেশগুলো কখনই কোনো বিদেশী সাহায্য পায় না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকার রাজনৈতিক ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে জনসংখ্যা কমানোয়। পশ্চিমী বিশেষজ্ঞদের মতে—'পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতা কমছে, বাড়ছে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ, এবং তৃতীয় বিশ্বের জনবিস্ফোরণই নাকি আসলে পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী'—সেজন্যই 1991 সালে বাংলাদেশের ঝড়ে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়, তখন ইন্টারন্যাশান্যাল হেরাল্ড ট্রিবউনে লেখা হল 'আমেরিকার সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে জনসংখ্যা কমাতে খুব দ্রুত এবং কঠোর ভাবেই পরিবার পরিকল্পনা চালানো উচিত।' এবং কোনও এক পশ্চিমী সাহিত্যিক অবলীলাক্রমে লিখলেন বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই নাকি প্রকৃতি এই প্রতিহিংসা নিয়েছে।"

আজকের এই জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু ক্ষতিকারক কনট্রাসেপটিভের প্রচলন ঘটিয়ে মহিলাদের গর্ভ থেকে কোটি কোটি টাকা লুটে নিয়ে তাদের হত্যা করে নিশ্চয়ই নয়। তৃতীয় বিশ্বের মহিলারা যে সমস্ত রোগে ভোগেন তার প্রায় অধিকাংশই আসে গর্ভাবস্থায় এবং শিশু জন্মের সময় নানারকমের জটিলতা থেকেই। যেমন জরায়ুর নানারকমের অসুখ, গর্ভপাত, ইনফেকশান, অত্যধিক রক্তপাত—এর সঙ্গে এ্যানিমিয়া ম্যালেরিয়া, অপুষ্টি ইত্যাদি তো আছেই। এদেশে শিশু জন্মের সময় যতসংখ্যক মহিলার মৃত্যু হয় তার প্রায় 16·5% এরই গর্ভাবস্থায় উপরোক্ত জটিলতা থাকেই। ছোট বড় মাঝারী সব মেয়েদের মধ্যেই কিন্তু এই স্ত্রী রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশী। যেখানে নারীর তার নিজস্ব শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নুন্যতম সচেতনতা গড়ে ওঠার সুযোগ নেই, সুযোগ নেই ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষার এবং এ্যানিমিয়ার মত রোগকেও সে প্রতিরোধ করতে পারে না সেখানে 'উন্নত' থেকে 'আরও উন্নত' কনস্ট্রাসেপ্টিভের প্রচার চালিয়ে 'দরিদ্র' 'গ্রাম্য', নিরক্ষর' 'অসচেতন' মহিলাদের মগজ ধোলাইকরণ আসলে উন্নত দেশগুলোর কনস্ট্রাসেপটিভের এই লাভজনক ব্যবসা টিকিয়ে রাখারই একটা চক্রান্ত মাত্র। মহিলাদের জন্য, হঠাৎ সবাই খুব দরদী হয়ে উঠল এমনটা ভাবার কোনও কারণই নেই।

নারীর স্বার্থহানিঃ কে দায়ী ?

আজকের জন্মনিয়ন্ত্রণের মূল নীতিই হল মেয়েদের 'প্রজনন যন্ত্রের' উপর 'আধুনিক' এবং 'উন্নত প্রযুক্তি' প্রয়োগ করে একে কর্মহীন করা। পশ্চিমী ব্যবসা ও রাষ্ট্র ধারণাটা দুনিয়াময় ছড়াচ্ছে। দুঃখের বিষয় এক ধরণের 'ফেমিনিজম' থেকেও তারা এ ব্যাপারে সমর্থন পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পশ্চিমী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন এবং মার্গারেট স্যাংগারের কথা। ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ড পেরেন্টহুড ফেডারেশন ও আমেরিকার সোসালিস্ট পার্টির নেত্রী এই স্যাংগার এবং তার সাথীরা 1921 সালে গড়ে তোলেন আমেরিকান ব্যর্থ কন্ট্রোল লীগ এবং 'দ্য পিভট অফ সিভিলাইজেশন' বইটিতে মার্গারেট খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করেছেন যে 'অশিক্ষিত এবং পশ্চাৎপদ জাতি আমাদের জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করতে পারে, তাই খারাপ সন্তান উৎপাদনকারী মায়েদের নির্বীজকরণ অবশ্যই প্রায়োজন। প্রজনন প্রযুক্তি যাই হোক না কেন ?'

উপরোক্ত মন্তব্য অবশ্যই প্রমাণ করে যে মেয়েদের অধিকারের নাম দিয়ে যে পশ্চিমী জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ঢেউ সেই '30 এর দশক থেকে চালু হয়েছে তার একটা বড় অংশ সবসময়ই ছিল জাতিগতমূলক, বর্ণবৈষম্যযুক্ত, সুপ্রজননসংক্রান্ত এবং গরীব বিরোধী। মার্গারেট স্যাংগার কোনোদিনই শ্রমজীবি শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তির দাবী এবং উৎপাদনের ওপর তাদের

নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দাবীকে স্বীকৃতি দেননি। ফলে মহিলাদের 'উপকারের' নামে প্রচলিত নীতি আসলে তাঁর মত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মহিলাদের স্বার্থরক্ষা করবে এতে আশ্চর্য কি? এলিট সম্প্রদায়ের এই মহিলারা কখনই নিজের কথা ছাড়া অন্যদের কথা ভাবতে শেখেননি ফলে কন্ট্রাসেপটিভের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণের এই অধিকার তাঁদের কাছে 'ব্যক্তিগত' অধিকার হিসাবেই এসেছে কোনও 'সামাজিক' অধিকার থেকে নয়। পিতৃতন্ত্রের কোন মৌলিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে মহিলাদের এই একক দাবী আসলে হাত শক্ত করেছে পিতৃতন্ত্রেরই। কারণ সন্তান জন্মদানের ব্যাপারটা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরোপুরিই ছিল পুরুষতন্ত্রের এক দমনমূলক নীতি। এর ফল হয়েছে যে বিশ্ব পুঁজিবাদ এবং সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক শক্তি একসাথেই কাজ করছে দুনিয়াজোড়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থাগুলো 'জন্মনিয়ন্ত্রণে'র ব্যাপারটাকে পুরোপুরি এক লভ্যাংশে পরিণত করেছে এবং করছে। বাণিজ্যিক বাজারের পণ্য তালিকায় যুক্ত হয়েছে নারীর গর্ভ। শুরু হয়েছে একের পর এক 'গর্ভনিরোধক' নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও নিত্যনতুন কন্ট্রাসেপটিভের প্রচলন ও প্রয়োগ শুধু নারীর জন্যই। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে গত কয়েক দশকে যেখানে মহিলাদের জন্য চালু হয়েছে অজস্র গর্ভনিরোধক সেখানে পুরুষদের জন্য রয়েছে মাত্র 2-3টে কনট্রাসেপটিভ।

ব্যাপারটাকে এমন ভাবে দেখা হয় যেন মহিলারাই আসলে বেশী সন্তান জন্মদানের জন্য দায়ী। তাই তাদের ওর চালাও যত বেশী পার নির্বীজকরণ প্রযুক্তি, সে যত ক্ষতিকারকই হোক না কেন।

পশ্চিমী মহিলাদের এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ার জন্য তারা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এবং আন্দোলনের মাধ্যমে উন্নত' দেশগুলোতে ক্ষতিকারক গর্ভ-নিরোধকের প্রয়োগ খানিকটা বন্ধ করতে পেরেছে ঠিকই কিন্তু গর্ভ-নিরোধকের পুরো বাজারটা চালু হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে।

ভারতেও এলিটদের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গরীববিরোধী, নারীবিরোধী মতামত ভয়ংকর প্রবল। এবং উচ্চবিত্ত মহিলাদের একাংশও এই মতামতের স্বপক্ষে। বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মদতে এরাই হয়ত ইণ্ডিয়ান ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশনের মত সংগঠনের মাধ্যমে এই উপমহাদেশের অসংখ্য মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র নারীকে বিপজ্জনক গর্ভনিরোধকের আওতায় টেনে আনার চেষ্টা করছে, তাদের বোঝাচ্ছে—নেট-এন নরপ্ল্যান্ট, ডিপো-প্রভেরা দিয়ে তোমায় আধুনিকতার আলোয় পৌঁছে দেব, গড়ে দেব সুখী-সুখী গৃহকোণ। অবশ্য এসবের মাধ্যমে নারীর জীবননাশের সম্ভাবনা যে প্রবল সেকথা একবারও বলা হচ্ছে না। রাষ্ট্র তো নিজস্ব স্বার্থেই সব জেনে বুঝেও না বোঝার ভান করবে। কারণ তার সঙ্গে ধনী দেশের ইউ এস এইড, ফোর্ড, রকফেলার ফাউণ্ডেশন, বিশ্বব্যাঙ্ক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চমৎকার বোঝাপড়া রয়েছে। এদের দেওয়া অনুদান, ঋণ সে নেয়। বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলোর কেনা ডাক্তাররা যারা নাকি নিজেদের মানবিক (দানবিক!) বলে দাবী করে, তারাও ওই পক্ষেই। ফলে নিজেদের প্রজনন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার যে অধিকার হওয়া উচিত ছিল একান্তভাবেই মেয়েদের নিজস্ব অধিকার, তা ক্রমশঃই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী এবং ঋণদানকারী সাহায্যদানকারী বিদেশী সংস্থাগুলোর হাতে। সামন্ততন্ত্রের পুতুল মহিলা এখন হল পুঁজিবাদের নয়া পুতুল, তকমা জুটল 'আধুনিকতা', 'প্রগতি' ও 'উন্নতি'র।

এই প্রচারে মিডিয়া, বিজ্ঞাপন ও মানুষের মগজ ধোলাইয়ের নানান ব্যবস্থাও হাত ধরাধরি করে আসছে। বিশ্বসুন্দরীও (তিনিও নারী!) চাইছেন পরিবেশ নিয়ে কাজ করতে। কাল হয়ত তাঁকেও মারাত্মক' জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নিয়েও প্রচারে নামতে হবে! নরপ্ল্যান্ট বা অন্য কোন জন্মনিরোধকের বিজ্ঞাপনে তাঁকে দেখলে হয়ত আমাদের বলতে হবে—একেই কি বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা! □

কাজল রায়

★ তথ্যসূত্রের জন্য বিওকি-র ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

শুয়োরের খামার ও কয়েকজন নাট্যকর্মী

চারপাশে যা দেখেছি ঃ এক

বাঙালী যুবকের গোঁফে-দাড়িতে যখন 'অন্যরকম' হাওয়া বইতে শুরু করে, সেসময় এলো চুলে আঙুল ডুবিয়ে অনেক তরুণ-তরুণীরই ইচ্ছে হয়—এক সঙ্গে থাকি।

গোলটেবিল ঘিরে একঝাঁক স্বপ্নিল চোখ। ছেলেমেয়েদের একরাশ হু-হু করা উত্তেজনা। আমাদের ছোট ছোট কটেজ থাকবে। ট্রাকটর, মাছ চাষ করবো, নিজেদের ফসল নিজেরাই ফলাবো। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে একটা ইনভলভ্‌মেন্ট—মালপত্র বেচা-কেনার জন্য ভ্যান থাকতে পারে—তবে নিজেদের বেড়ানোর জন্য আমরা ঘোড়া কিনবো। নানান রঙের।—"আর আমি কিন্তু বারমুডা আর টুপি পড়ে গাছে জল দেবো"—আপনার পাশ থেকে উত্তেজনার ঘোরে কোনও জলজ্যান্ত মেয়ে বলে উঠতে পারে এ কথা। এ সব অসম্ভব, অবাস্তব স্বপ্নের কথা।

কিন্তু খামার বাড়ির স্বপ্ন জীবন-যাপনের মধ্যে রেখে সত্যিই যে দিনগুলো ভিন্নভাবে গড়ে তোলা যায়, তা প্রমাণ করতেই যেন তৈরী হয়েছে 'স্নো হোয়াইট পিগারি।' বাংলা করলে দাঁড়ায় বরফ সাদা শুয়োরের খামার (নিন্দুকেরা অবশ্যই বলবে খোঁয়াড়)। উত্তর চব্বিশ পরগণার অশোকনগর থেকে যে রাস্তাটা সোজা নৈহাটির দিকে চলে গেছে—৪ নং স্কিম কালীবাড়ির মোড় থেকে সেই রাস্তায় মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই পাওয়া যাবে এই যৌথ জীবনযাপনের খোঁজ। অশোকনগর শ্মশানের প্রায় উল্টো-দিকের জমিতে শুরু হয়েছে জীবনের যজ্ঞ। ছটি ছেলে ও চারটি মেয়ে এব্যাপারেও একমত যে, এই কাঠখড় পোড়ানোটা যথেষ্ট লাভজনকও বটে।

লাভ ক্ষতির হিসেব ভাবাকুল স্বপ্নকে হয়তো আঘাত করতে পারে, কিন্তু এটাই সত্যি যে শুধু কথায় আর চিঁড়ে ভিজছে না। তাই যে-যে ইচ্ছে মাথায় নিয়ে এই শুয়োরের খামার গড়ে উঠেছে, অর্থ তথা অন্নসংস্থান তার প্রথম শর্ত। আলোচনার দ্বিতীয় বিষয় এই সংস্থার সমবায় পদ্ধতি। আর তিন নম্বর পর্যায়ে রয়েছে স্বপ্ন নিয়ে কাজ অথবা নাটক করতে করতে সেই স্বপ্নগুলোকে প্রস্ফুটিত করার কথা।

প্রাণীহত্যা কতটুকু মানবিক এ প্রশ্ন আপাতত শিকেয় তুলে রেখেই বলা যায় শুয়োরের খামার তৈরী অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। ক্রমবর্ধমান বেকারির এই রাজত্বে এ ধরণের প্রচেষ্টা একটা উল্লেখযোগ্য নজির। খামারে কাজ করতে করতেই দেবল, বাঘা, মানিক, রুমা, কৃষ্ণরা টপাটপ বলে যায়, ইংল্যান্ডের ব্রীড ইয়র্কশায়ার বা ল্যান্ডরেশ গ্রুপের ধবধবে শুয়োরেরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ বড়ো হয়ে ওঠে। তিন কেজি খাবার খাওয়ানো হলে মাংস বাড়ে কেজি-খানেক। আর এতো বেশী সংখ্যক মানুষেরা এখন শুয়োরের মাংস খাচ্ছে যে চাহিদার তুলনায় জুগিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। দেশের বাজার তো বটেই বিদেশেও এখন খাদ্যতালিকার প্রথম সারিতে উঠে এসেছে শুয়োরের মাংস। পর্ক থেকে তৈরি হ্যাম, বেকন, সসেজ, সালামি প্রভৃতি খাদ্য সারা

পৃথিবীর রসিকেরা চেটেপুটে খাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গেও এমন লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

আর মূলত এদের দিকে তাকিয়েই 1992 সালের 16 মার্চ শুরু হয়েছিল স্নো হোয়াইট পিগারির কাজ।

ইতিমধ্যে শুয়োর সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ওদের জানা হয়ে গেছে। 'শুয়োরের বাচ্চা' শব্দ হিসেবে যতই শ্রুতিকটু হোক না কেন একটি মাদী শুয়োরের একবারে বাচ্চা হয় 10 থেকে 16টা পর্যন্ত। প্রসব হয় বছরে দু'বার। বাচ্চাগুলো প্রথম দু'মাস মায়ের কোলের কাছে ঘুরঘুর করে। ফিডিং বোতলে দুধ আর মাংস্ খাওয়াতে হয়। দু'মাস পর ওজন হয় 12 থেকে 15 কেজি। এই বাচ্চা-গুলোকে অন্য খামারে চালানের জন্য বিক্রি করা যেতে পারে।

এ সব তথ্য এখন সম্পূর্ণ কাজে লাগানো হয়েছে স্নো হোয়াইট পিগারিতে। 2 মাস বয়সী কিছু বাচ্চাকে বিক্রি করে, কয়েকটি নিজেদের কাছে রাখা হয় বলে জানালেন সংস্থার অন্যতম সদস্য সমীর। পরবর্তী চার মাস তাদের ম্যাস জাতীয় খাবার খাওয়ানো হয়। প্রথম ছ'মাসে প্রায় প্রতিটি বাচ্চা 180 কেজি ম্যাস্ খেয়ে 60 কেজি ওজনের হয়ে ওঠে। মানুষের বাচ্চারা তার ধারে কাছেও ঠেকর দিতে পারবে না—এমন অসম্ভব ওজন!

ব্যবসাটা হয় দু'দিক থেকে। এক, বাচ্চা তৈরী করে বিক্রি করা, দ্বিতীয়ত, বড়ো করে মাংসের জন্য বিক্রি করা। বাজারে গড়পড়তা 1 কেজি মাংসের দর 30 টাকা থেকে 35 টাকা। এছাড়া পশম, বিষ্ঠা, রক্ত প্রভৃতি বিক্রিও লাভজনক, যদিও স্নো হোয়াইট পিগারি এখনও তা তেমনভাবে শুরু করেনি। শুধু মাংস ও বাচ্চা বিক্রি করে যে লাভের গুড় তৈরি হয়, তা যে কোনও পিঁপড়ের পক্ষে খেয়ে ফেলা সত্যিই কষ্টকর।

শুয়োর পালনের ক্ষেত্রে জায়গাটা একটা বড়ো ব্যাপার, দেবল জানালেন, যে সব মাদী শুয়োর বাচ্চা দেবে সেগুলোর জন্য 60 থেকে 80 স্কোয়ার ফুট ঘর প্রয়োজন। আর মাংসের জন্য যাকে বড়ো করে তোলা হবে তার ঘর হবে বারো থেকে ষোল স্কোয়ার ফুট। একটা বাচ্চা শুয়োর থেকে প্রায় 500 টাকা এবং একটা 6 মাসের শুয়োর মাংসের জন্য বিক্রি করলে প্রায় এক হাজার টাকা লাভ করা যায়। আপাত ভাবে হয়তো মনে হতে পারে বড়ো তো করলাম কিন্তু কিনবে কে? ওদের মুখেই শোনা গেল, শুধু কলকাতাতেই শুয়োরের মাংসের যে চাহিদা তার প্রায় দশভাগের এক ভাগ উৎপন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গে। বাকিটা আসে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, এমনকি দক্ষিণভারত থেকে। সুতরাং চ্যার্লি চ্যাপলিন যে খামার করার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন সার্থক করে টাকা পয়সার দিক থেকে স্বনির্ভর হতে পারে বাঙালী যুবকেরা।

অশোকনগর-হাবরা অঞ্চল শুধু নয়, খামারের সুবাদে স্নো হোয়াইট পিগারির সদস্যরা এখন পরিচিত অনেকের কাছেই। ওরা প্রথমে 48 হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন সমবায় সমিতি তৈরী করে। মানিকের কথা অনুযায়ী, সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে অল্প সুদে ঋণ নেওয়া। তাছাড়া সমবায় সমিতি এটাও শেখাতে পারে যে প্রতিযোগিতা নয়—সহযোগিতাতেই বেঁচে থাকা সম্ভব। সমিতির প্রতিটি সদস্যই একাধারে মালিক ও শ্রমিক। লাভের অংশ সংস্থার। কিন্তু সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে ডিভিডেন্ট পায়। আশেপাশের যত বেশী সংখ্যক মানুষকে এই সমিতির আওতায় আনা যাবে, পারস্পরিক বোঝাপড়া ব্যাপারটা ততই সহজ হয়ে উঠবে বলে ওদের মনে হয়। এই অবিশ্বাসী, প্রতারক, প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে বসেও কয়েকজন ছেলেমেয়ে এমন কথা ভাবতে পারছে—এ বড়ো কম কথা নয়।

আর শুধু ভেবে ভেবেই যে ওদের চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে তা নয়—খামারের ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই 'অন্বীক্ষা' সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত। বস্তুত নাটক আর জীবন-যাপন ব্যাপারটাকে ওরা প্রায় মিলিয়ে

মিশিয়ে ফেলতে চাইছে। একসময় মণিপুরের নাট্যপরিচালক রতন থিয়ামের আদর্শ ওদের অনুপ্রাণিত করেছিল। রতন থিয়াম নাটকের দলের ছেলেমেয়েদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর করার জন্য শুয়োরের খামার তৈরী করেছেন। অন্বীক্ষার ছেলে-মেয়েরা বন্ধ কলকারখানা, প্লাস্টিক শিল্প, বালিয়াপাল প্রভৃতি সমাজ সচেতন বিষয় নিয়ে পথনাটক করে চলেছে বেশ কয়েক বছর। এই সচেতনা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠছে জীবন-যাপনের দিক থেকেও প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছাকাছি চলে আসার ক্ষেত্রে। কিন্তু রতন থিয়ামের মতো বিদেশী অনুদান ওরা কখনোই নেবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এই প্রতিজ্ঞা থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে যৌথতা। তৈরী হচ্ছে কমিটমেন্ট। যে কমিটমেন্টের দায় আমরা কখনোই এড়িয়ে যেতে পারিনা। ওদের দেখে মনে হয় আমাদের চার-পাশের রাজত্বে যে নেই-মানুষদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধে এ যেন এক বিকল্প জীবনযাপন। বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠার এক স্বপ্নিল ইচ্ছাপূরণ। □

অপূর্ব সাহা
মানিক পাইন

---

* 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'কে ঠিক সময়ে উপযুক্ত বিষয়বস্তু সহ প্রকাশিত হতে সাহায্য করুন।

* লেখা পাঠান—'উন্নয়ন' কে ঘিরে বিতর্ক বা পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রচনা—গণস্বাস্থ্য বা নিউক্লিয়ার শক্তি সব কিছুই বি ও বি সাদরে গ্রহণ করবে। বিশেষ অনুরোধ—স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান বা সমীক্ষার জন্য বি ও বিতে নিয়মিত বিভাগ রাখা হচ্ছে। এই বিভাগে লেখা পাঠান।

* গ্রাহক হোন কাছের মানুষদের গ্রাহক হতে সাহায্য করুন। একটি ছোট্ট উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখতে আপনার সহযোগিতা খুবই জরুরী।

* বি ও বি পাওয়া যাচ্ছে—শিয়ালদা নর্থ স্টেশন—প্রথম গেট, উৎস মানুষ, বুক মার্ক ও রাসবিহারী—আশুতোষ মুখার্জী রোড জংশন, ডেকার্স লেন (দিলীপ মজুমদারের স্টল)।

'ডিপো-প্রভেরা' নিয়ে বিক্ষোভ

একটি রিপোর্ট

গত 27 আগস্ট কলকাতার অভিজাত হোটেল "তাজ বেঙ্গলে"র সামনে ঘটল এক অভিনব ঘটনা। 'ডিপো প্রভেরা' নামক গর্ভনিরোধক ইনজেকশনটি এদেশে চালু করার বিরোধিতা করার জন্য ঐদিন সন্ধ্যেবেলা তাজ বেঙ্গলের সামনে হাজির হয়েছিলেন ড্রাগ এ্যাকশন ফোরাম, বিভিন্ন এলাকার গণবিজ্ঞান সংগঠন ও মহিলা সংঘর মত সামাজিক সংগঠনের 80 থেকে 90 জন মানুষ। সর্ব সাকুল্যে এই 80-90 জন প্রতিবাদী মানুষকে সামলানোর জন্য ঐদিন হোটেলের সামনে হাজির ছিল 2 গাড়ী পুলিস।

ম্যাক্স ফার্মা কোম্পানী কলকাতার নামীদামী ডাক্তারবাবুদের কয়েকজনকে তাজবেঙ্গলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ডিপো প্রভেরা চালু করার বিষয়ে কিছু আলোচনার জন্য। উদ্দেশ্যটা অবশ্যই নানান লোভের জাল ছড়িয়ে এমন ব্যবস্থা করা যাতে এঁরা কারণে-অকারণে ডিপো-প্রভেরা প্রেসক্রাইব করেন। খবরটা কানে আসতেই প্রতিবাদী গংগঠনগুলো তাদের সীমিত সংখ্যক সদস্য নিয়ে হোটেলের গেটে 27 তারিখ সন্ধ্যেবেলা হাজির হয়েছিলো। তাদের ব্যানার, পোস্টার ইত্যাদি দেখে হঠাৎই হোটেলের ভিতর থেকে অযাচিত ভাবে একজন এসে জানিয়ে গেল যে মীটিং বাতিল হয়েছে। কিন্তু মজাটা হল এই যে, জনৈক বিক্ষোভকারী হঠাৎ হোটেলে ঢুকে গিয়ে দেখেন নির্ধারিত জায়গাতেই মীটিং চলছে। ব্যাপারটা জানতে পারার পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবাদীদের বিক্ষোভ একটু জোরালো হয়। তারা সোচ্চারে ব্যানার ও পোস্টার ইত্যাদি হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। আর কয়েকজন, আমন্ত্রিত ডাক্তারবাবুদের পাকড়িয়ে তাঁদের মধ্যেও (এর জন্য গাড়ীও আটকাতে হয়েছে) লিফলেট বিলি করতে থাকেন। কিন্তু এতে হোটেলের নিরাপত্তাকর্মী এবং পুলিস একই সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বাধা দেয়। এর ফলে তাৎক্ষনিকভাবে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বড় রকম কিছু ঘটার আশংকায় হোটেল কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি গেট বন্ধ করে দেয়। না, বড় রকমের অঘটন কিছু ঘটেনি। 2 গাড়ী পুলিসকেও সক্রিয় হতে হয়নি। সেদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচী ঐখানেই শেষ হয়। পরে খবর পাওয়া যায় যে ভিতরে উপস্থিত হওয়া ডাক্তারবাবুদের কয়েকজন ইনজেকশনটির ক্ষতিকর দিক নিয়ে নানান প্রশ্ন তোলেন। এবং এ নিয়ে তর্ক বিতর্কও চলে বেশ কিছুক্ষণ।

যদিও আমরা জানি, আপজন বা ম্যাক্স ফার্মার মত কোম্পানীগুলি এইসব ছোটখাটো প্রতিবাদের তোয়াক্কা করে না, তবুও ওদের সেদিনের কার্যকলাপ থেকে একথা মানতেই হবে, যে "ওরা ভয় পেয়েছে"। সামান্য হলেও, হ্যাঁ, ওরা ভয়ই পেয়েছে। তাই পুরো ব্যাপারটা ওদের গোপনে সারবার

প্রচেষ্টা নিতে হয়েছে। মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। প্রতিবাদ হয়েছে।

আমরা মনে করি, এই প্রতিবাদের জোর যদি বাড়ানো যায়, যদি একটানা প্রচার চালানো যায় এর বিরুদ্ধে, তবে হয়তো ইনজেকশনটি বন্ধ করা যেতেও পারে। প্রতিবাদ আরো জোরালো হবে, বন্ধ হবে গরিব দেশের মহিলাদের নিয়ে ছেলেখেলা, এই প্রত্যাশা নিয়েই আমরা অপেক্ষা করব। □

পূরবী ঘোষ

★ ডিপো-প্রভেরা নিয়ে বিশদ জানতে হলে বিওবি-র জুলাই-সেপ্টেম্বর '94 সংখ্যা দেখুন।

মা ন স

মনোরোগী ও তাদের পরিবারের পরিজনদের একটি সংস্থা

ক্লিনিক ঃ শনিবার বিকেল চারটে থেকে ছ'টা

স্থান ঃ 17B মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড, পার্ক সার্কাস,

কলকাতা—700017

সপ্তাহে দুদিন মদনপুর 'তেঘরি গ্রামে'

বুধবার সকাল 9-11 টা মানসিক রোগীদের জন্য

রবিবার সকাল 9-11 টা সাধারণ রোগীদের জন্য

ইংরেজী মাসের প্রথম রবিবার 12-30 মিঃ—3-30 মিঃ স্বল্পমূল্যে চক্ষু চিকিৎসা

মানস ডে-কেয়ার সেণ্টার

সোম—শুক্র দুপুর 12—4 টে

স্থান ঃ 57C, বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-700003

চিঠিপত্রে যোগাযোগ ঃ মানস

প্রযত্নে ঃ অমল সোম, P239 কিম্বার স্ট্রীট, কলকাতা-700017

ফিলিপাইন্‌সের পেপসি-বিরোধী আন্দোলন

— অন্য স্বাদে

চারপাশটা বদলাতে আগ্রহী সামাজিক-রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্টরা জানেন যে কোনো ব্যাপারেই আজকাল মানুষজন সহজে সাড়া দিতে চান না তা সে যতই নিষ্ঠুর শোষণ-বঞ্চনা চোখের সামনে চলুক না কেন।

এক বন্ধু বলছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। দীর্ঘদিন ধরে চলা নিপীড়ণের ঘটনা সরাসরি সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ প্রচার করে তিনি দেখেছেন কেউই নড়ে বসতে চান না। অথচ খেলার টিকিট নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফুরিয়ে যাওয়ার মত ঘটনাতেও জনতাকে বিক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখেছেন তিনি।

কোন ঘটনায় মানুষ প্রতিবাদ করে এবং কোথায়ই বা সে নিশ্চুপ এই নিয়ে অনেকেরই নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, তবে 1992 সালে শুরু হওয়া ফিলিপাইন্‌সের এক ঘটনা এ ব্যাপারে সত্যিই আমাদের নজর কাড়ার যোগ্য। ঘটনাটা এই রকম……

1992 সালে পেপসি কোম্পানী (এক নামজাদা বহুজাতিক কোম্পানী যাদের পেপসি কোলা আমাদের এখানেও দোকান-বাজার ছেয়ে ফেলেছে) ফিলিপাইন্‌সের খবরের কাগজ, রেডিও এবং টিভিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এক বিজ্ঞাপনের ঝড় বইয়ে দেয়। তাদের বক্তব্য ছিল ('আজই আপনি দশ লক্ষ টাকার মালিক হতে পারেন।' কোনো একটি বিশেষ নাম্বারযুক্ত ছিপিসহ পেপসির বোতল তারা বাজারে ছেড়েছে। এই ছিপি যার হাতে পড়বে সে মালিক হবে দশ লক্ষ পেসোর (পেসো-ফিলিপাইনসের মুদ্রা), মার্কিনী মুদ্রার হিসেবে যা হল চল্লিশ হাজার ডলার। এই বিজ্ঞাপন ঢেউ-এর ফলে বহু পরিবার সকালে-বিকেলে পেপসি খেতে লাগল আর একে অন্যের সাথে পাল্লা দিয়ে জমাতে লাগল ছিপির পাহাড়। প্রতি রাতে, প্রায় প্রার্থনা করার মতো পরিবারগুলো টিভির সামনে অপেক্ষা করেছে সেই বিশেষ নাম্বারের আশায় যা তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে পারে। ঠিক এমনিই এক রাতে টেলিভিশনের মাধ্যমে পেপসি ঘোষণা করল সেই বিশেষ নাম্বার—সংখ্যাটি ছিল 349। যার কাছে এই নাম্বার যুক্ত ছিপিটি আছে সেই ভাগ্যবানই মালিক হবে এই বিপুল অংকের টাকার।

আপাতভাবে সবই ঠিক ছিল। শুধু পেপসি যে গন্ডগোলটা করে ফেলেছিল সেটা হল যে তারা একটি ভুল নাম্বার বাজারে ছেড়েছিল। লস এঞ্জেলেস টাইমস-এর ভাষায় 'মার্কেটিং-এর দুনিয়ায় এমন এক ভুল পেপসি করেছে যা দুনিয়ায় সবচেয়ে জঘন্য ভুল হিসেবে পরিগণিত হবে।

একজন বিজয়ীর জন্য একটি ছিপিতে বিশেষ নাম্বার লাগানোর জায়গায় তারা 800,000 বোতলের ছিপিতে 349 সংখ্যাটি ছাপিয়েছে। ফলে খুব তাড়াতাড়িই বেশ কয়েক হাজার মানুষ পুরস্কার দাবী করতে শুরু করে, যার হিসেব 100 কোটি ডলারকেও ছাড়িয়ে গেছে। পেপসি এত টাকা দিতে অস্বীকার করেছে…'

এর ফলাফল ? পেপসিরই রেকর্ড

অনুযায়ী পেপসির পানীয় বওয়া ট্রাকগুলির অন্তত 32টিতে পাথর ছোঁড়া হয়েছে, আগুন লাগান হয়েছে বা উল্টে দেওয়া হয়েছে।

সশস্ত্র লোকেরা পেপসির কারখানা ও অফিসে আগুনে বোমা ছুঁড়েছে। সবচেয়ে বীভৎস এক ঘটনা ঘটে রাজধানী ম্যানিলার এক শহরতলি অঞ্চলে। 13 ফেব্রুয়ারী, 1993 একটি দাঁড়িয়ে থাকা পেপসির ট্রাকে এক ধরণের একটি গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। গ্রেনেডটি ট্রাকে না ফেটে ছিটকে আসে এবং রাস্তায় ফাটে। এই বিস্ফোরণে একজন স্কুল শিক্ষক ও একটি পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে মারা যায়, আহত হয় আরও ছ'জন।

পেপসির কর্মকর্তারা প্রচুর খুনের হুমকি পায়। ফলে তারা সারাক্ষণ দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরতে শুরু করে। এমন কি তাদের অফিস যাওয়া বা বাইরে ঘুরতে যাওয়াও খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে পেপসির প্রত্যেকটি ট্রাকের মাথায় বন্দুকধারী রক্ষী বসান হয়। ওই বহুজাতিক কোম্পানীর প্রায় সমস্ত মার্কিন অফিসারদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয়ভাবে কর্তৃত্ব দেওয়া হয় এমন একজন লোককে যে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত বেইরুটে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।

1993-র সেপ্টেম্বর মাস অবধি হিসেব অনুযায়ী পেপসির কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে দেওয়ানী মামলা দায়ের হয়েছে 22,000এরও বেশী। আর 5,200টি ফৌজদারী মামলায় লোকঠকানো ও জুয়াচুরির অভিযোগ আনা হয়েছে। লস এঞ্জেলেস টাইমস-এর রিপোর্টলেখক বব্ ড্রোগিনের ভাষায় 'এ দেশের সর্বদিকে চুরি-ঘুষ আর দারিদ্র্য, লোডশেডিং মানুষের নিত্যসঙ্গি—কিন্তু একমাত্র প্রতিবাদ যা ক্রুদ্ধ জনতাকে নিয়মিত রাস্তায় নামাচ্ছে তা হল পেপসির বিরুদ্ধে।'

পেপসির বিরুদ্ধে সংগঠিত উদ্যোগ, যেমন—কোয়ালিশন 349, হাজার হাজার মানুষকে টেনে আনছিল। ড্রোগিনের বক্তব্য অনুযায়ী-রাজধানী ম্যানিলার এক চরম ভ্যাপসা গরম বিকেল। বিক্ষোভ-সমাবেশের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন চুয়ান্নো বছর বয়সী এক মহিলা, প্যাশিয়েনশিয়া সালেম। ড্রোগিনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন আগের বছর এই রকম এক বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালীন স্ট্রোক হয়ে তাঁর স্বামী মারা যান্ এবং তিনিও তৈরী আছেন এই একই রকম পরিণতির জন্য। প্যাশিয়েনশিয়ার ভাষায় 'আমি যদি মারাও যাই, আমার ভূত ফিরে আসবে পেপসির সাথে লড়তে। কারণ এটা ওদের ভুল আমাদের নয়। ওরা পুরস্কারের পয়সা দিচ্ছে না। তাই আমরা লড়ছি।'

ফিলিপাইন্সের মানুষ এমন এক ব্যবস্থার মধ্যে বেঁচে আছেন যা প্রত্যেক দিন তাঁদের মর্যাদা, তাঁদের শ্রমশক্তিকে লুঠ করছে। লক্ষ্য করার বিষয় হল যে অধিকাংশ ভুক্তভোগী, আক্রান্ত মানুষই কিন্তু প্রতিমুহূর্তের এই নিপীড়ন-অত্যাচারের প্রতিবাদ করছেন না। অথচ পেপসি একটাই ভুল করেছে। (কোন একজন মানুষের পয়সাওয়ালা হওয়াটা আটকে গেছে) আর তার ফলে প্রতিবাদ সর্বত্র।

মানুষের প্রতিবাদ করা বা না করা কিসের ওপর নির্ভর করে? ধরুন খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতেই কোন লটারীর প্রাইজে দু নম্বরী হল কিছু ফাটকাবাজ, আমলাদের যোগসাজশে। প্রকৃত ক্রেতারা ঠকলো, কিছুই পেলো না। কি হতে পারে সেক্ষেত্রে? বিরাট ঝামেলা ও গন্ডগোল তো হওয়ার কথাই। অথচ বাস্তবে 'সৎ লটারী'র টিকিটের ক্রেতারা যে সামগ্রিক ভাবে সব সময়ই ঠকেন এটা কিন্তু কাউকে একটুও বিচলিত করে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। যেটা আমাদের চোখে খানিকটা কৌতুকবহ মনে হতে পারে। আমেরিকার এক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু কর্মী প্রচার চালাচ্ছিলেন ছোট্ট দেশ এল সালভাডোরের ওপর মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের নোংরা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। প্রচুর খাটাখাটনির পরেও তাঁরা তেমন একটা সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হন। অথচ হঠাৎ করেই তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে

ক্যাম্পাসে ছেলে ও মেয়েদের সাধারণ (কমন) বাথরুম আলাদা করে দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষর আদেশকে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করছেন এবং সে নিয়ে শুরু হয়ে গেল এক বিরাট আন্দোলন!

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য—আমরা কি খুঁজবো? একজায়গায় মানুষ নিপীড়িত অবস্থার মধ্যেই মাথা গুঁজে থেকে যাচ্ছে, বিদ্রোহ করছে না। অন্য জায়গায় কখনও কখনও সে এমন বিষয় নিয়ে ফেটে পড়ছে যা আসলে তার জীবনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসবে না।

একটা মতামত হল যে পেপসির অপরাধ এবং পুঁজি ও রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী নিপীড়নের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ তফাত আছে। পেপসি ভুল করেছে, তার জন্য তাকে চেপে ধরা যায়, ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। অর্থাৎ কি হতে পারে, একটা বিকল্প ছবি মানুষের মাথায় আছে। কিন্তু পুঁজি যেভাবে প্রতিদিন সবদিক থেকে আমাদের আষ্টেপৃষ্টে মারে, ক্লান্ত করে দেয়, তার সুরাহা কি ভাবে হবে? এমনটা তো মনে হতেই পারে যে এ আমাদের জীবনেরই একটা অংশ, প্রায় নিয়তির মতো, যাকে এড়িয়ে যাবার কোনো রাস্তাই নেই! এ যন্ত্রণা প্রাকৃতিক নিয়মের মত!

যদি আমরা মেনে নিই যে উপরে যে ভাবে বলা হল তফাতটা প্রধানত সেখানেই হচ্ছে, তবে আমাদের উদ্যোগে, আমাদের প্রয়াসে এই দিকটাতেই জোর দিতে হবে যে টিভিতে প্রতিটি বিজ্ঞাপন, প্রতিটি চাকরির প্রতিশ্রুতি, প্রতিটি সরকারি বাণী, পেপসির পুরস্কারের ভাঁড়ার থেকে খুব আলাদা কিছু নয়। আমাদের বুঝতে হবে 'পাইয়ে দেওয়া'র এইসব খুড়োর কল কত মারাত্মক। কাজটা সহজ নয়। কারণ যতক্ষণ না প্রকৃত বিকল্পের এক স্বচ্ছ পরিস্কার ছবি আমরা তৈরী করতে পারছি, ততক্ষণ চিন্তায় চেতনায় কোন সত্যিকারের পরিবর্তন দূর অস্ত্। □

সংকলক—সুরঞ্জন কর

★ তথ্যসূত্র—জেড ম্যাগাজিন, সেপ্টেম্বর 1993 সংখ্যা

★ জেড ম্যাগাজিনের পরিচিতির জন্য বি ও বি-র ষষ্ঠদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর) দেখুন।

শক্তিশঙ্কর মনোবিকাশ কেন্দ্র

মনোরোগীদের জন্য আবাসিক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন সহায়ক কেন্দ্র

স্থান : লাভপুর, বীরভূম, 731303

উদ্যোক্তা : নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

10A, পার্শিবাগান লেন, কলকাতা-700009

মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলাদের জরায়ু ছেদন

নিষ্ঠুরতার এক উদাহরণ

"1994-এর 20 থেকে 27 নভেম্বর দিল্লীতে বিশ্বব্যাপী মানসিক প্রতিবন্ধীদের একটা সম্মেলন হবে। এর প্রস্তুতি কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণমন্ত্রী শ্রীসীতারাম কেশরী সাংবাদিকদের বলেছেন যে সরকার শীগগিরই মানসিক প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ দেখার জন্য আইন করে একটি ট্রাস্ট গঠন করবেন। এই ট্রাস্ট মানসিক প্রতিবন্ধীরা যাতে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তার দেখভাল করবে। এই সাংবাদিক বৈঠকেই কল্যাণ দপ্তরের যুগ্মসচিব শ্রী এ. কে চৌধুরী বলেন এদেশে জড়বুদ্ধি ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় 1·40 কোটি। এঁদের নিয়ে কাজ করছেন এমন প্রায় 100টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার 3 থেকে 4 কোটি টাকা সাহায্য দিচ্ছেন।" [সূত্র, হিন্দুস্থান টাইমস, 20/10/94]

ওপরের খবরটা পড়লে মনে হয় যে মানসিক প্রতিবন্ধীরা যাতে অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র না হন, তাঁরা যাতে সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারেন সে ব্যাপারে রাষ্ট্র যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে। সত্যিই কি তাই ?

গত 4 ফেব্রুয়ারী, 1994 ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাগজের প্রথম পাতায় খবর ছিল "25টি মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়ের জরায়ু কেটে বাদ দেওয়া হবে।"

"খ্যাতনামা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শিরিশ শেঠ পুনের সাসুন হাসপাতালে জরায়ু বাদ দেবেন অপারেশন করে। খরচা দেবে পুনের রোটারী ক্লাব।"

আরও জানা যায় সরকার অনুমোদিত (পুনের কাছে) শিরুর হোমের মেয়েদের এই অপারেশন করার জন্য ডাঃ শেঠকে অনুরোধ করেছেন মহারাষ্ট্র সরকারের নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ দপ্তরের ডিরেক্টর বন্দনা খুল্লার স্বয়ং। তিনি নাকি 30টি মেয়ের জন্য অপারেশনের সুপারিশ করেছিলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে জরায়ু বাদ দেবার জন্য 18 জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। খবরের কাগজে এ বিষয়ে তাঁর মতামত পরে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন এটি একটি বিতর্কিত বিষয়, ঝুঁকিও আছে। তাই তাঁর পূর্বসূরীরা সাহস করে সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন নি। নইলে তিন বছর আগেই একথা উঠেছিল। খুল্লারের মতে এতে মেয়েরা অপারেশনের পরে সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবে।

ডাঃ শেঠ, যিনি এই অপারেশন করবেন, তিনিও মনে করেন এতে মেয়েদের উপকার হবে। তাঁর মতে যৌন লাঞ্ছনার শিকার হয় এইসব মেয়েরা প্রায়ই। অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার ঠেকাতেই এই অপারেশন দরকার। তাছাড়া এই মেয়েরা নিজেদের পরিষ্কার রাখতে পারেনা, জরায়ু বাদ দিলে জরায়ু সংক্রমণের ঝুঁকি কমে যাবে, রক্তশূন্যতাও কমবে। সংবাদ মাধ্যমকে জানান যে তিনি অতীতে

প্রায় আরো 100টি এরকম অপারেশন করেছেন।

হয়তো বন্দনা খুল্লার, শিরিশ শেঠ এবং পুনের রোটারী ক্লাবের কর্মকর্তারা ভেবেছিলেন যে মেয়েদের তাঁরা দারুণ উপকার করছেন। তাই অপারেশনটার একটু প্রচার তাঁরা চেয়েছিলেন।

ফলটা কিন্তু হল উল্টো। 24 ফেব্রুয়ারী এই বর্বর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে একটা সভা হল। তাতে অংশ নিলেন স্ত্রী কৃতি, শ্রমজীবিকা, ফোরাম এগেনস্ট অপ্রেসন অফ উইমেন, লোকাশী হক সংগঠন, ন্যাশনাল অ্যাডিকশন রিসার্চ সেন্টার প্রমুখ নারী, শ্রমজীবী ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং প্রতিবন্ধী সন্তানের বাবামায়েরা। সভা মহারাষ্ট্র সরকারের সিদ্ধান্তকে নিন্দা করে একটা প্রস্তাব নেয়। তাছাড়া সাসুন হাসপাতালের সামনে মেডিকো ফ্রেন্ড সার্কল. জনবাদী মহিলা সংগঠন এবং স্ত্রী কৃতির সদস্যরা একটা ধর্ণা দেন।

হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও জরায়ু ছেদনের প্রতিবাদে এই ধর্ণায় যোগ দেন। এই ঘটনাটা নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ হয়। শ্রীমতী অহল্যা রঙ্গনেকর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করেন। ফেব্রুয়ারির চার তারিখে 11টি মেয়ের অপারেশন হয়ে যায়।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী জানান যে সরকার 'ঠিক 'গণ অপারেশন' করার কথা ভাবছেন না, তবে এই অপারেশন হয়েছে তাঁদের সবুজ সংকেত পেয়েই। তাঁর সরকার, হোম কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তারদের সিদ্ধান্তের ওপরেই আস্থা রাখেন। পরে এই নিয়ে বিধান সভায়ও প্রশ্নোত্তর চলে। বিধায়ক শ্রীমতী এস ফড়নবিশ প্রশ্ন তোলেন "সারা প্রদেশ জুড়ে সব মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের জরায়ু বাদ দেবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?" প্রশ্নোত্তর পর্বে মুখ্যমন্ত্রী জানান তিনি অনেকজন বিশেষজ্ঞ, মনোবিদ ও সমাজকর্মীর মতামত নিয়েছেন। তাঁরা এর পক্ষেই রায় দিয়েছেন তবে বেশী হৈ চৈ না করতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রতিবাদকারীরা এরপরে শিরুর হোম ঘুরে দেখেন, পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী হোমেও যান এবং কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেন। তাঁরা বম্বে ও পুনের বেশ কয়েকজন ডাক্তার ও পুনের ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন-এর সদস্যদের সাথে কথা বলেন। অধিকাংশ ডাক্তারই এর বিপক্ষে মতামত দেন।

স্কুল অফ মেন্টালি ডেফিশিয়েন্ট গার্লস্, শিরুর ঃ

পুনে থেকে 65 কিলোমিটার দূরে শিরুর হোমটি মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য মহারাষ্ট্রের একমাত্র সরকারী স্কুল। বাসিন্দা 49 জন। এঁদের বেশীর ভাগেরই বুদ্ধাঙ্ক (আই কিউ!) খুব কম। তাছাড়া নানা অসুখ তো আছেই। 10 জন মৃগীরোগী, 5 জন মূক ও বধির, 2 জন হাঁটতে পারেন না, বেশ কয়েকজন যক্ষ্মায় ভোগেন। অধিকাংশেরই রক্তশূন্যতা ও চুলকুনি জাতীয় চামড়ার অসুখ আছে।

হোমের সরকারী বরাদ্দ বছরে 4·65 লাখ টাকা, অনুমোদিত পদের সংখ্যা 18 জন। চারজন শিক্ষিকার পদই খালি রয়েছে বছর দুয়েক। মাত্র একজন ক্র্যাফ্‌ট শিক্ষিকা—তাঁর আবার জড় বুদ্ধিদের কিভাবে শেখাতে হয় সে নিয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই।

দশটা 25 ফুট বাই 30 ফুট ঘর। ঘরগুলোতে আলো-বাতাস আছে. তবে ন্যাড়া এবং নিরানন্দ। কোন শিক্ষামূলক উপকরণ বা যন্ত্রপাতি নেই। একঘেয়েমি কাটানোর একমাত্র উপায় একটি মাত্র টিভি।

খরাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত এই হোমটিতে জলের কষ্ট লেগেই আছে। 10টা ঘর থেকেই আসছে মলমূত্রের গন্ধ। এ সম্পর্কে সুপার শ্রীমতী সোমাবেন বলেন "ওসব আমাদের সহ্য হয়ে গেছে। এক একবারে মাত্র দুজন করে দেখাশুনোর লোক দিয়েছে। কেমন করে আমরা সব কিছু ঠিকঠাক রাখব?" এটা খুবই পরিষ্কার যে এই মেয়েদের নিজেদের কাজ নিজেরা করে

নেওয়া শেখানোর জন্য কোন সচেতন চেষ্টা এখানে নেই। যা সহায়তা এঁরা পান তা আসে কিছুটা সক্ষম অন্য বাসিন্দাদের থেকেই। যাঁরা কিছুই পারেন না, তাঁরা সব সময়টা বসে বসেই কাটান।

মেয়েদের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য নিজস্ব কোন গাড়ী নেই হোমের, অসুখ বিসুখ হলে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যেও না। নেই সবার জামা কাপড় কাচার মেশিন, এম্বুলেন্স আর সৌরচুলাও তবে এগুলো পাবার আশা আছে। একই ক্যাম্পাসে অন্য দুটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও কোন লেনদেন নেই।

এক কথায় অবস্থা ভয়াবহ! 1991 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বর্ষা কুলকার্নি 'সকাল' পত্রিকায় শিরুর হোম সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন "গত ছমাসে ছজন মারা গেছে"। 93-এর নভেম্বর থেকে 94-এর মার্চ এর মধ্যে মারা গেছেন 4 জন, বেশীর ভাগেরই মৃত্যুর কারণ রক্তশূন্যতা ও আমাশা।

অন্য হোমগুলি ঃ

বম্বে ও পুনের অন্য কয়েকটি সরকারী বেসরকারী হোমের কর্তৃপক্ষও প্রতিবন্দী মেয়েদের জন্য জরায়ু বাদ দেবার সুপারিশ করেন। তবে এঁরা অভিভাবকদের দিয়ে অপারেশন করিয়ে নেন ভর্তি করার আগেই।

ব্যতিক্রম ? অবশ্যই আছে। দিল্লীর সাহাদারার ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার এন্ড এলায়েড সায়েন্সেস এবং সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত বম্বের "আশা দান"। এখানে কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে না যে এদের নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে জরায়ু ছেদন করা দরকার। এঁরা প্রতিবন্ধীদের স্কুলে পাঠান ও নিজের কাজ নিজে করতে শেখান। সক্ষমদের অন্যান্য হাতের কাজ এবং পরস্পরকে সাহায্য করতে শেখানো হয়।

ঘরগুলিতে ছবি ও আশে পাশে গাছপালা দিয়ে সাজানো। ঘরে মলমূত্রের গন্ধ নেই।

কোনরকম তুলনা না করেও বলা বলা যায় যে এই সমীক্ষায় সরকার, আমলা ও একশ্রেণীর চিকিৎসকদের মনোভাবটা খুবই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। হয়তো এটা আমাদের সমাজের 'সুসভ্য' কিছু মানুষের মনোভাবের প্রতিফলন। সেটা হল ঃ—

(1) আমলাদের এইসব প্রতিবন্ধী মানুষগুলোকে নিজেদের কাজ নিজে শেখানোয় বা হাতের কাজ শেখানো বা একঘেয়েমি কাটানোর জন্য কোন বিনোদনের ব্যবস্থা করার বিন্দুমাত্র আগ্রহও নেই। একথাটা সবাই জানেন যে, ব্যস্ত থাকার মত কোন কাজ না পেলে অনেক জড় বুদ্ধি মানুষ নিজেদের শরীর থেকে নির্গত পদার্থ ঘেঁটে নিজেদের আনন্দ দেবার চেষ্টা করেন। সহানুভূতি ও ধৈর্য্য নিয়ে চেষ্টা করলে এঁদের নিশ্চয়ই শেখানো যেত, কেমন করে নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। উপযুক্ত সহানুভূতিশীল লোকের অভাব আমাদের দেশে নেই। আমরা জানি যে জড়বুদ্ধি লোকেরা বেশী পরিশ্রমী হন, যেটা করেন তাঁরা খুব মন দিয়ে করেন, ফাঁকি দেন না। হাতের কাজ শেখালে এঁদের শ্রমকে সমাজের উপকারে লাগানো যেত। মজার ব্যাপার হল জরায়ু অপারেশনের জন্য টাকার সংস্থান হয়, কিন্তু টাকার অভাব কেবলমাত্র শিক্ষিকা বা দেখা-শোনা করার লোক নিয়োগ করার বেলায়ই! নাকি সদিচ্ছার অভাব!

(2) জরায়ু অপারেশন একটি বড় অপারেশন, এটি অজ্ঞান করে করতে হয়। এতে ঝুঁকি যথেষ্ট, বিশেষতঃ মূত্রনালী বা মূত্রথলিতে আঘাত লাগলে জীবন বিপন্ন হতে পারে। ঝুঁকি আছে অজ্ঞান করার প্রক্রিয়ায় এবং অপারেশনের পরেও। যে অসহায় মানুষরা অপারেশনের ভালমন্দ বোঝেন না বা সম্মতি দিতে অক্ষম তাঁদের জোর করে অঙ্গচ্ছেদ করে সরকার মানব অধিকার ভঙ্গ করেছেন। আমলা ও ডাক্তারের এই "যা করেছি ভালর জন্যই করেছি" গোছের বড়দা সুলভ মনোভাব নিন্দনীয়। একে প্রশ্রয় দিলে দুর্বলেরা শক্তিমানের হাতে আরো অত্যাচার ভোগ করবে।

(3) যাঁদের কোনদিন সন্তান হবে না, তাদের জরায়ু-থাকার কোন দরকার

নেই, অতএব বাদ দাও—এই সিদ্ধান্ত এই ভ্রান্ত দর্শন থেকেই এসেছে, যে দর্শন মানুষকে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন যন্ত্রের সমষ্টি বলে মনে করে। শরীরের ভারসাম্য কি করে বজায় থাকে সে সম্বন্ধে চিকিৎসাশাস্ত্র এখনও সব কথা জানে না। জরায়ু ছেদনের দূরবর্তী প্রভাব সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার ধারণা আমাদের নেই।

4) যে কারণে এই অপারেশন করা হল তার নজীর বিশ্বে কোথাও নেই, নোংরা মেখে বসে থাকা বন্ধ করার জন্য এই ডাক্তার কি ভবিষ্যতে মল-মূত্রের দ্বারও বন্ধ করার জন্য অপারেশনের সুপারিশ করবেন ?

5) অজ্ঞান অবস্থায় শরীর থেকে অন্য কোন অঙ্গ কেটে নিলে রোগী জানতে পারে না। সারা দুনিয়ায় এখন 'নল জাতক' নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ডিম্বাশয়ের খুব চাহিদা। কোন অসাধু সার্জন যদি চুরি করে কোন অঙ্গ কেটে নেন তবে তার জন্যে কে দায়িত্ব নেবে ? কে গ্যারান্টী দেবে যে লুকিয়ে কোন বিপজ্জনক ওষুধ প্রয়োগ বা পরীক্ষা নিরীক্ষা এইসব অসহায় মানুষের উপর করা হবে না ?

6) 'ঋতু' আমাদের সামাজিক সংস্কারে অশুচি। দেখাশোনা করার লোকদের কর্তৃপক্ষের শেখানো উচিত ছিল যে এটি একটি স্বাভাবিক শরীরের ধর্ম, ঋতুকে নোংরা বলে মেনে নিয়ে কর্তৃপক্ষ নারীশরীরকে ঘৃণা করার প্রচলিত মনোভাবকেই প্রশ্রয় দিলেন।

7) সবশেষে এইসব "মহৎ উপকারী" ব্যক্তিরা বলে বেড়ান যে "অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব এতে এড়ানো যাবে, সম্মান নিয়ে এতে মেয়েরা বাঁচতে পারবেন।" এই ধারণা ভুল, কারণ অপারেশন করানো থাকলেই যৌন লাঞ্ছনা বেশী হবার সম্ভাবনা। আর এটা কর্তৃপক্ষের অপদার্থতার চরম প্রমাণও। মেয়েদের রক্ষা করার ব্যবস্থা বা দুষ্কৃতকারীদের সাজা দেবার ব্যবস্থা করতে তাঁরা অপারগ ; পারেন শুধু মেয়েদের জরায়ু বাদ দিয়ে কেলেংকারী এড়াতে ! সরকারী হোমে যৌন অত্যাচার তো "হেফাজতে ধর্ষণ" ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার গুলোর জনদরদী মুখোশের আড়ালে আছে সমাজের কতগুলি অসহায় মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর মনোভাব। হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে টাকার দাম কমে যাওয়ায় প্রতিবন্ধী কল্যাণ খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ব্যয় বরাদ্দ ক্রমেই কমছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ভারত সরকারের প্রতিবন্ধী কল্যাণ খাতে বরাদ্দ ব্যয় ছিল 91-92 আর্থিক বছরে 41·33 কোটি টাকা, 93-94-এ ছিল 52·89 কোটি আর 94-95-এ 52·69 কোটি টাকা।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আই এম এফ-এর চাপে স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য ব্যয় বরাদ্দ আগামী বছরগুলিতে আরো কমে যাবে। সাধারণত যেকোন জনসমূহের 2% লোকের মানসিক প্রতিবন্ধী হবার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেশে এই বিপুল সংখ্যক লোকেরা বেশীর ভাগই থাকেন পরিবারে। আগামী বছর গুলিতে বেকারী বাড়বে, পরিবারগুলিও আরো গরীব হবে, ফলে এইসব অসহায় মানুষগুলিও পরিবারের কাছ হতে যেটুকু যত্ন পাচ্ছিলেন তা ক্রমেই কমতে বাধ্য। পাশাপাশি রাষ্ট্র যে কি নিষ্ঠুর ভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারে উপরে বলা ঘটনা তারই প্রমাণ।

এই অবস্থায় আমরা নাগরিক হিসেবে যদি সচেতন না হই, সামাজিক ভাবে যদি আমাদেরই সাথী এই প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য আশ্রয় ও মানবিক পরিবেশ না তৈরী করতে পারি তবে ভবিষ্যতে আপনার আমার কাছের মানসিক প্রতিবন্ধি নারী পুরুষের জন্য অপেক্ষা করছে এক ভয়ংকর অন্ধকার সময়। তার দায়িত্ব মানুষ হিসেবে আমাদেরও। □

সঙ্কলক—অমিতা

মূল রিপোর্ট—ইন দ্যা গুইজ অফ হিউম্যান ডিগনিটি

★ মূল রিপোর্টের কপির জন্য লিখুন ঃ ফোরাম ফর উইমেনস হেলথ, 2, বিশ্বদীপ, 95, ভাউ দাজি রোড, মাতুঙ্গা, বোম্বে-400019

জল কদ্দুর গড়ায়

পরিক্রমা : এক

সংবাদে প্রকাশ এবারের বর্ষায় দিল্লীর পথঘাটও জলে ডুবেছিল। এমন তো কলকাতাতেই হয় জানা ছিল। তা'বলে রাজধানীতেও? স্বভাবতঃই পৌরসভার ঘুম ছুট্। ব্যাপার কি জানতে লোক লাগলো। জানা গেল কালপ্রিট—পলিথিলীন ব্যাগ। পথেঘাটে ছড়িয়ে থাকা পলি-ব্যাগে নর্দমা বুজে এই বিপত্তি!

এই তথ্য প্রকাশ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আর চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। পলিব্যাগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে প্লাস্টিক ব্যাগ পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। এগুলো মাটিতে পড়ে সহজে পচে না। মাটিতে মিশেও যায় না। ফলে জমতে থাকে ক্রমশঃ। এর আস্তরণ ভেদ করে জমির জল ভূগর্ভে প্রবেশ করতে পারে না। ভূগর্ভের জলভাণ্ডার পুষ্ট হয় না। অতএব পলিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ হওয়া উচিত। এই মর্মে তারা আজি পেশ করেছে কেন্দ্রীয় পরিবেশ দপ্তরে। দেখা যাক ওনারা কি করেন।

দিল্লীর পথে জল জমায় উপকার একটা হল। পলিব্যাগ নিয়ে প্রশ্ন উঠল। বিতর্কটা অন্তত শুরু হল। প্লাস্টিক ব্যাগের সুবিধে অনেক। অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে কি মূল্যে এই সুবিধে সেটা ভেবে দেখার।

নীল সাদা সবুজ হলুদ—হরেক রঙের পলিব্যাগ বাজারের সব ধরনের ক্রেতার মন জয় করে ফেলেছে। খালি হাতে বাজারে চলে গেলেও অসুবিধে নেই। আগে জামাকাপড় বা ওষুধের দোকানেই ওই ব্যাগ মিলত। এখন মাছ তরিতরকারীর দোকানেও মেলে। রোজ খান্ কতক এমন ব্যাগ জমা হয় শহরের প্রায় সব বাড়ীতেই। আর বাড়ী পৌঁছেই সেগুলোর আস্তানা হয় জঞ্জালের ডিব্বায়। সহজেই অনুমেয় কি পরিমাণ ব্যাগের জঞ্জাল তৈরী হয় এক একটি বড় শহরে!

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হুমকিতে কতটুকু কাজ হবে জানা নেই। কারণ অভ্যাস বদলানো শক্ত। বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা কেউই এই সুবিধে ছাড়তে চাইবেন না। তবুও বিতর্ক তুলে তারা ভালই করেছেন। ব্যবহার বন্ধ করা না গেলেও এর প্রসার রোধ করতে পারলেও যথেষ্ট।

পর্ষদ কেবল দূষণের প্রশ্নই তুলেছেন। অন্য দিকগুলোও ভাবার বিষয়। এটা অনর্থক অপচয়ও বটে। পলিব্যাগ পেট্রোকেমিক্যালজাত দ্রব্য। উৎপাদন মূল্যের হিসেবে এখন খুবই সস্তা মনে হচ্ছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে তেমন থাকবে না। খনিজ তেল নিঃশেষের পথে। অতএব এর লাগামহীন ব্যবহার অনৈতিক।

এছাড়া একবার ব্যবহার করেই ছুঁড়ে ফেলার এই প্রবণতাটাও ভাল নয়। বিশেষ করে আমাদের মত দেশে। এরকম মানসিকতা আমাদের দেশে আগে ছিল না। পশ্চিমী ধনী দেশে এর উদ্ভব।—যেন খুব বাহাদুরি! সম্প্রতি আমদানী হয়েছে এখানেও। তবে জেনে রাখা ভাল ওসব দেশেও এই মানসিকতার নিন্দা হচ্ছে। অনেকে বিরোধিতাও করেছেন। □ —র. চ.

প্লুটোনিয়াম চোরাই

পরিক্রমা : দুই

তেজস্ক্রিয় লিথিয়াম-ইউরেনিয়াম-প্লুটোনিয়াম এখন সিকিউরিটি-জাল ফুটো করে বেরিয়ে এসে চোরা-চালানকারীদের হাতে হাতে ঘুরছে। জার্মানীর বিমান বন্দরে গত মাস-খানেকের মধ্যে বেশ কয়েকটি চোরা চালানের ঘটনা ধরা পড়েছে। বেজায় হৈ চৈ লেগে গেছে তা নিয়ে। বিশেষ করে পশ্চিমী দেশে।

এই চোরাই মাল নিশ্চয়ই ঘর সাজাতে কিনছে না কেউ। এর চলতি বাজার দর কেজি প্রতি কয়েকশ কোটি টাকা হওয়াও বিচিত্র নয়। তাতে কিছু এসে যায় না। বোমা বানানোর প্রতিযোগিতায় মরিয়া বহু দেশ। ইচ্ছে করলেই দেশে বানিয়ে নেবে এই মশলা এত সহজ নয় ব্যাপারটা। ফলে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরেছে তারা। অভাব হয়নি যোগানদারের।

গোটা ব্যাপারটা স্বাভাবিক পথে এগিয়ে এই পরিণতিতে দাঁড়িয়েছে। তবু অবাক লাগছে পশ্চিমী দেশগুলির এমন বিচলিতভাব দেখে। যেন এমন যে ঘটতে পারে জানাই ছিল না তাদের। মনের আনন্দে নিউক্লিয়ার বোমার মশলা বানিয়ে আসছে পঞ্চাশ বছর ধরে। অন্য দিকে দুনিয়া জুড়ে শত শত অ্যান্টিনিউক্লিয়ার গ্রুপ এগুলি বেহাত হওয়ার আশঙ্কার কথা প্রচার করে এসেছে এক নাগাড়ে। বি ও বি-র পুরনো পাঠকরা জানেন সে কথা। সে কথায় কান দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি সেই সব মহান (!) দেশের নেতাগণ। আজ জার্মানীর ঘরে ঘরে কুকুর নিয়ে তল্লাশী চলছে চোরা-চালানকারী ধরবার জন্য!

এদিকে আমাদের দেশেও হুজুগের হাওয়া এসে লেগেছে। তাবৎ রাজনৈতিক দলের মুখিয়ারা গেল গেল রব তুলেছে। তা বলে এজন্য নয় যে এমন ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয় বস্তু নানান হাতে ছড়িয়ে পড়লে কি বিপদ ঘটতে পারে! তাদের উদ্বেগের কারণ হ'ল বোমার মশলাগুলো নাকি পাকিস্তানে পাচার হচ্ছে!

আসলে এদেশের কোন রাজনৈতিক দলই পরমাণু-প্রকল্পের বিরোধী নয়। তবে সেটা তাদের পছন্দের কোন দেশের হাতে থাকলেই তারা নিশ্চিন্ত। আরো নিশ্চিন্ত যদি সেটা তাদের নিজেদের হেপাজতে থাকে।

যেমন আমাদের দেশে তেমন অন্য দেশেও আছেন এমন লোক।—এমন রাজনৈতিক দল। যারা এমনটাই মনে করেন। পাকিস্তানেও তারা থাকবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? □

—র. চ.

দেড় কোটি বনাম কুড়ি

পরিক্রমা : তিন

'পৃথ্বী'র পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপনের কাজ সফল।—এ খবরে উচ্ছ্বসিত সকলে। পৃথ্বী হল ভারতে তৈরী স্বল্প-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। এছাড়াও বিভিন্ন পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুতির পথে। আলাদা আলাদা এদের নাম। পুরাণ-কাহিনীর পাতা ঘেঁটে মন জুড়ানো নাম বার করা হয়েছে। যেমন, অগ্নি, ত্রিশূল, আকাশ, নাগ। পৃথ্বীর উৎক্ষেপণ কাজ দেখার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর উচ্চ-

পদস্থ অফিসারেরা। খুব শিগ্‌গির পৃথ্বীকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের প্রযুক্তি পৃথিবীর খুব বেশী দেশের হাতে নেই। ফলে অনেককে অন্য দেশের দোরে দোরে ঘুরতে হয়। এক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি লক্ষ্যনীয়। অনেকের ঈর্ষার বিষয়ও বটে। পাকিস্তান এ ব্যাপারে পেছিয়ে আছে। তারা চীনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে এক ধরনের মিসাইল। শোনা যাচ্ছে সৌদি আরবের হাতেও এসে গেছে আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল। যেটা পরমাণু অস্ত্র বহনের জন্যই প্রয়োজন হয়। অনুমান এটিও এসেছে চীনের কাছ থেকে।

অর্থাৎ অস্ত্র লেনদেনের কাজ জোর কদমে চলছে দুনিয়া জুড়ে। অনুমান করা হয়েছিল ঠাণ্ডা-লড়াই পর্বের অবসানের সাথে সাথে এ প্রবনতা হ্রাস পাবে। এবং সেই সুযোগে দেশে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে। একেই বলা হয়েছিল 'পীস-ডিভিডেণ্ড'।

ইউ এন ডি পি-র একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে 'দ্রুত অপসৃয়মান এই সুযোগ'। এই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে অনেক দেশ। ব্যর্থ দেশের তালিকায় ভারতও আছে। অস্ত্রসংগ্রহের প্রয়াস থামায়নি এরা। দৃষ্টান্ত হিসেবে সম্প্রতি ভারতের কুড়িটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান মিগ-27 কেনার উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। তারা হিসেব কষে দেখিয়েছেন—এই টাকায় দেশের দেড়-কোটি স্কুল-ছুট শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেত। অনুপাতটা লক্ষ্যনীয়। দেড়-কোটি শিশুর শিক্ষার সুযোগের মূল্যে কেনা গেছে মাত্র কুড়িটি যুদ্ধ বিমান!

6ই অক্টোবরের একটি খবরে প্রকাশ তেমন একটি মিগ বিমান পরীক্ষামূলক উড়ানের সময় ভেঙে পড়েছে।—যেন কাচের গ্লাস। টুক্ করে পড়ল আর ভেঙে গেল। কত অর্থ গেল? —জানি না। তবে ওপরের হিসেব মত, এতে সাড়ে সাত লক্ষ শিশুর শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া যেত!! □

—র. চ.

Space Donated By

A WELL WISHER

চিত্র সমালোচনা

কিস্‌কি রক্ষা (ভিডিও ছবি) হিন্দী 52 মিনিট, 1994, পরিচালনা : শ্রী প্রকাশ, সূত্র : সেন্টিচ

জঙ্গলের সন্তান আদিবাসীরা অস্বীকার করলো তাদের পূর্বপুরুষের জমি বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে। উল্টে মিছিল, মিটিং, ধর্না, শ্লোগানে মুখরিত করে তুললো নেতারহাট, ডালটনগঞ্জ, রাঁচী এলাকা। বিহারের এই অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকা ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনীর স্থায়ী ফায়ারিং রেঞ্জ অনুশীলন কেন্দ্র হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল। গত চল্লিশ বছর ধরে অস্থায়ী ফায়ারিং রেঞ্জ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিলো এই এলাকার সংরক্ষিত অরণ্য অঞ্চল। ফলে স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রাণ হাতে করে জঙ্গলে ঢুকতে হতো প্রতিদিনের জ্বালানী, পাতা, ফল সংগ্রহ ও গবাদি পশুদের চরানোর জন্য। বৃদ্ধ শিশু ও অসুস্থদের জোর করে তাড়ানো হচ্ছিল কারণ সৈন্যবাহিনী বোমা, গুলি ছোঁড়া অভ্যাস করবে। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধরা হাতে হাত মিলিয়ে গড়ে তুললেন এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

প্রশ্ন উঠল কার স্বার্থে, কার রক্ষার জন্য, এই বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, চারণ ভূমি এবং চাষের জমি সামগ্রিকভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে, স্থানীয় মানুষ ও পশুদের বেঁচে থাকার অধিকারকে অস্বীকার করে। আদিবাসীদের জীবন জীবিকা অরণ্য নির্ভর। জঙ্গল তাঁদের বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। জঙ্গল থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে দিন-মজুর হয়ে যাবে, তাদের এই আশঙ্কা সত্যি বলে প্রমাণিত। ভারতের অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতেও দেখা গেছে অকার্যকরী পুণর্বাসন, পরিকল্পনা কোনভাবেই এদের জীবনে কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। দিন-মজুর বা কর্মহীন হতে বাধ্য করেছে। বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের 245টি গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জোট বেঁধে একসুরে বলছেন, 'মরবো কিন্তু এই জমি ছাড়বো না। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের জঙ্গল, গৃহপালিত পশু, চাষের জমি, কোনো কিছুই আমরা অস্ত্র পরীক্ষার চাঁদমারি হতে দেব না।'

শ্রীপ্রকাশের এই তথ্যচিত্র অক্টোবর 1993 থেকে মার্চ 1994 অবধি এই আন্দোলনের ঘটনা সমূহকে তুলে ধরেছে। 52 মিনিটের এই তথ্যচিত্রে কোন ধারাভাষ্য নেই। নিপুণ সম্পাদনায় আন্দোলনের কর্মীদের ভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে। □

সূত্র : ভিডিও স্কেপ, জুন 1994

★ শেষ সংবাদ—দ্যা স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রকাশিত খবর অনুযায়ী সমবেত প্রতিবাদের মুখে দাঁড়িয়ে আপাতত কর্তৃপক্ষ পিছু হটেছেন। চেস্ট রেঞ্জের কাজ বন্ধ আছে।

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে অভিজিত লাহিড়ী
পি 252, লেক টাউন,
ব্লক এ, কলকাতা-700089

আর এন 34929/79
ষষ্ঠদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
অক্টোবর—ডিসেম্বর '94

একটি আবেদন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার 1994 সালের চারটি সংখ্যা একত্রে পাওয়া যাচ্ছে। মূল্য ঃ 20 টাকা (ডাক খরচ সহ)। 1995 সালের জন্য গ্রাহক হোন।

গ্রাহক চাঁদা ঃ ব্যাক্তি—বার্ষিক 16 টাকা (ডাক যোগে 20 টাকা)

☐ বিশেষ ক্ষেত্রে 10 টাকা (ডাক যোগে 14 টাকা)

প্রতিষ্ঠান ঃ বার্ষিক 50 টাকা (ডাক খরচ সহ)

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা লিখবেন।

☐ পুরনো বি ও বি-র সংখ্যার জন্য যোগাযোগের ঠিকানায় লিখুন।

যাঁরা কাজ করেছেন—কম্পোজ ☐ গীতশ্রী সেন, স্বপন সেন, দুলাল বোস ॥ মেক আপ ☐ স্বপন সেন ॥ মেশিনম্যান ☐ কালীবাবু ॥ বাইণ্ডিং ☐ লক্ষণ দাস ॥ মুদ্রক ☐ সমুদ্র ঘোষ।

বি ও বির পক্ষ থেকে—স্বাতী, সত্যব্রত, নিত্যানন্দ, শেখর।

প্রচ্ছদ ☐ রবীন চক্রবর্তী, অলক।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-9, ফোন—350-7967 থেকে মুদ্রিত।